বিচারপতি বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত

শম্ভুনাথ পণ্ডিত

প্রথম ভারতীয় বিচারপতি

পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৫,

প্রকাশক : নীলাঞ্জনা বসু
৮২ জি, বি.পি.এম.বি. সরনী, ভদ্রকালী

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : শীলাঞ্জনা দত্ত

ব্যবস্থাপনায় : পুস্তক বিপণি

মুদ্রক : বসু মুদ্রন, কলকাতা-৭০০০০৪

সূচীপত্র

			পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ	:	জাষ্টিস চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়	৯
ভূমিকা	:	ডঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র	১১
লেখিকার কথা	:		১৩
লেখকের কথা (২)	:		১৭
পিতৃপুরুষের বাসভূমি	:		১৯
বংশ পরিচয়	:		২১
বাল্যকাল ও শিক্ষা	:		২৩
গার্হস্থ্য / ব্যবহারিক জীবন	:		৩৫
তিরোধান	:		৮২
চারিত্রিক বিশিষ্টতা / চরিত্রায়ণ	:		৮৭
স্মৃতিরক্ষণ	:		৯৯
পরিশিষ্ট	:		

- News published in respect of appointment on the first Indian Judge — ১০১
- News published after demise — ১০৪
- Notice of condolence meeting & a full report of the meeting published by the "Hindoo Patriot" — ১১৩

জীবনপঞ্জী : ১৩১

বংশপঞ্জী : ১৩৩

ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জী ও
পত্রপত্রিকা সমূহ : ১৩৪

চিত্রসূচী :

- শম্ভুনাথ পণ্ডিত
- উপেন্দ্রনাথ পণ্ডিত কৃত শম্ভুনাথের স্ত্রীর আবক্ষ মূর্ত্তি
- মেয়র কোর্ট (১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দ)
- সুপ্রীম কোর্ট (১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ)
- সমসাময়িক বিচারপতিদের সাথে শম্ভুনাথ
- সদর দেওয়ানী আদালত (১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ)
- ক্যাপ্টেন প্রিন্সেপ কর্ত্তৃকঅঙ্কিত কলিকাতার মানচিত্রে শম্ভুনাথের বসতবাটীর অবস্থান।
- বর্তমান অবস্থায় শম্ভুনাথের বসতবাড়ী (প্রায় অপরিবর্তিত)
- শম্ভুনাথের আবক্ষ মূর্ত্তি (শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল)
- শম্ভুনাথের আবক্ষ মূর্ত্তি (কলকাতা হাইকোর্ট)

মুখবন্ধ

বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশের অন্যতম বিশিষ্ট ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। ভবানীপুরে একটি সরকারী হাসপাতাল ও একটি জনপথ শম্ভুনাথের নামাঙ্কিত —তবুও বর্তমানে অধিকাংশের কাছে তাঁর নাম প্রায় অপরিচিত— যদিও শম্ভুনাথের জীবন ও কর্ম আজকের দিনেও প্রাসঙ্গিক।

শম্ভুনাথের জন্ম কাশ্মিরী পণ্ডিত বংশে — আর্থিক অনটনের জন্যে তাঁর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীতেই সমাপ্ত হয় ও সদর দেওয়ানী আদালতের মহাফেজখানায় তিনি কর্মগ্রহণ করেছিলেন। সম্পূর্ণ নিজের আগ্রহে ও অধ্যবসায়ের দ্বারা আইন শাস্ত্রে তিনি ব্যুৎপত্তি লাভ করেন ও আইন পরীক্ষা পাশ করে আইনজীবী হন। স্বল্প সময়ের মধ্যে শম্ভুনাথ অভাবনীয় সাফল্যলাভ করেছিলেন। তিনি কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম ভারতীয় বিচারপতি নিযুক্ত হন। সামান্য করনিক হয়ে কর্মজীবন আরম্ভ করে হাইকোর্টের বিচারপতির আসনে আরোহন আজকের দিনেও বিরল দৃষ্টান্ত।

শম্ভুনাথ সমাজ সচেতন ব্যক্তি ছিলেন। সমাজ সংস্কার, নারী শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি বিষয়ে তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে শম্ভুনাথের মাত্র ৪৭ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়েছিল।

ইতিপূর্বে শম্ভুনাথের পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য জীবনী লেখা হয়নি। শম্ভুনাথের পঞ্চম প্রজন্ম শ্রীমতী চিন্ময়ী পণ্ডিত দত্ত ও তাঁর স্বামী অমলেশ চন্দ্র দত্ত শম্ভুনাথের স্মৃতিরক্ষার জন্য অবিরত প্রচেষ্টা করে চলেছেন। শম্ভুনাথ স্মৃতি রক্ষা সমিতি গঠিত হয়েছে। শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে শম্ভুনাথের একটি আবক্ষমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। হাইকোর্টেও শম্ভুনাথের আবক্ষমূর্তি স্থাপনা করা হয়েছে। প্রতি বৎসর শম্ভুনাথের মৃত্যুদিবসও পালিত হচ্ছে।

এই গ্রন্থের রচয়িতা দুজন তথ্য সংগ্রহে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। আমার প্রত্যাশা এই জীবনীগ্রন্থ শম্ভুনাথ ও তাঁর সমসাময়িক বা সময়ের ইতিহাসের একটি আকর গ্রন্থ বলে বিবেচিত হবে। আমি আশা করি এই বই এর পরবর্তী সংস্করণে আরো তথ্য সংযোজিত করা সম্ভব হবে।

এই মূল্যবান বইটি রচনার জন্য রচয়িতাদের অভিনন্দন করছি। বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

শম্ভুনাথ পণ্ডিতের সঙ্গে সাধারণ মানুষের পরিচয় দক্ষিণ কোলকাতার এক বড় রাস্তা আর হাঁসপাতালের নামের মধ্যে দিয়ে। শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট আর শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালের নাম অনেকেরই জানা আছে। কিন্তু কে ছিলেন এই শম্ভুনাথ পণ্ডিত, কবে, কোথায়, কোন্ পরিবারে তাঁর জন্ম, কি ছিল তাঁর বিদ্যা আর কর্ম, কি ছিল তাঁর ঘর সংসার আর সামাজিক প্রতিষ্ঠা, এ সব সম্পর্কে খুব কম লোকই জানে। তার মূল কারণ শম্ভুনাথ পণ্ডিতের কোনও জীবনী এ পর্যন্ত লেখা হয় নি। বর্তমান লেখক সেই অভাব পূরণ করেছেন এই গ্রন্থে, নানা পুরানো পত্র-পত্রিকা ঘেঁটে, নানা গ্রন্থাগারে গিয়ে তিনি এই জীবনী রচনা করেছেন। এতে আছে সমসাময়িক গ্রন্থ ও সংবাদ পত্র থেকে উদ্ধৃতি, পরিচিতদের শ্রদ্ধা নিবেদন, চরিত্র বিশ্লেষণ প্রভৃতি।

গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে শম্ভুনাথ পণ্ডিতের জন্ম হয়েছিল কাশ্মীরের বিখ্যাত পণ্ডিত সম্প্রদায়ে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে আর মৃত্যু ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে। ১৮২৩ এ তিনি মামার বাড়ী লক্ষ্ণৌ-এ আসেন। সেখানে তিনি উর্দু, ফার্সী প্রভৃতি ভাষায় কৃতবিদ্য হন। ১৮৩৪এ তাঁর প্রথম বিবাহ হয়, একটি কন্যার জন্ম দিয়ে তাঁর স্ত্রী অকালে পরলোক গমন করেন। তাঁর বাবারও মৃত্যু হয়। তিনি এক বাঙালী মহিলাকে বিবাহ করেন। অর্থ উপার্জনের জন্যে ডিক্রিজারীর মুহুরির পদ প্রাপ্ত হন। সঙ্গে সঙ্গে চলে তর্জমা করার কাজ। অধ্যবসায়ী শম্ভুনাথ পণ্ডিত আইনের সনদ পেয়ে ওকালতি সুরু করেন আর গ্রন্থরচনাও করেন। বেথুন সাহেবের সঙ্গে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে তিনি ব্রতী হন। অন্য জাতে দ্বিতীয়া স্ত্রী গ্রহণ করায় তাঁর নিজের সমাজ তাঁর সঙ্গে সংস্রব কাটায়। এই বাঙালী স্ত্রী তাঁকে স্বজাতীয় স্ত্রী বিবাহ করতে উৎসাহিত করেন। শম্ভুনাথ তৃতীয় বিবাহ করেন এক কাশ্মিরী যুবতীকে। এই বিবাহগুলি থেকে অনেক সন্তান হয়। সঙ্গে সঙ্গে চলে তাঁর জনসেবা। বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পরিচালনা সমিতির সদস্য, ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, হিন্দু পেট্রিয়টের লেখক, জুনিয়ার গভর্নমেন্ট প্লীডার, হিন্দু কলেজে আইনের অধ্যাপক, পরে সিনিয়ার গভর্নমেন্ট প্লীডার, উকিল এসোসিয়েশনের প্রথম সভাপতি— এই সব অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাঁর সাফল্য হয়। ১৮৬২ র শেষের দিকে তিনি কোলকাতা হাইকোর্টের প্রথম ভারতীয় বিচারক হিসাবে নিযুক্ত হয়ে পরের বছর ঐ আসনে বসেন। তাঁর বিচার ক্ষমতা সম্পর্কে বেশ কিছু মতামত উদ্ধৃত করা হয়েছে এই গ্রন্থে। শেষ জীবনে তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। সংক্ষেপে এই হল শম্ভুনাথ

পণ্ডিতের কৃতিত্বের পরিচয়। কাশ্মীরে পণ্ডিত সম্প্রদায়ে জন্মেও তিনি বাংলার লোক হয়ে গিয়েছিলেন। এই গ্রন্থে এই সব বিচিত্র কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তাঁর তিরোধানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান শোক অর্পণ করেন। সে সম্পর্কে ব্যাপক উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

লেখকের ভাষা প্রাঞ্জল ও প্রসাদগুণসম্পন্ন। তিনি কৃতী মানুষ শম্ভুনাথ পণ্ডিতের এক উজ্জ্বল চিত্র অংকিত করেছেন। বর্তমান প্রজন্মের লোকের কাছে ঊনবিংশ শতাব্দীর এই জ্যোতিষ্ক নতুন করে স্পষ্ট হয়ে উঠবে, আমার এই বিশ্বাস।

লেখিকার কথা

কলকাতার ভবানীপুরে শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীটস্থ বাড়ীতে আমার জন্ম। জ্ঞান হওয়া অবধি দেখে আসছি বিরাট দরজার উপরে শম্ভুনাথের উপবিষ্ট অবস্থার সুন্দর বাঁধানো ফটো। যে কোন স্মরনীয় মুহূর্তে যা চোখে পড়ে যায় এবং মনে একটা ছাপ রেখে যায়। একটু বড় বয়সে রাস্তায় বা বাসে-ট্রামে ভেসে আসা দু এক টুকরো কথা - একজন হয়তো তার সাথীকে বলছে 'জানিস শম্ভুনাথ একজন বড় ডাক্তার ছিলেন - খুব পশার ছিল - প্রচুর উপায় ছিল- ভাল লোকও ছিলেন - তাইতো গরীবদের জন্য এই শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাতপাতাল প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।' বাবার-বলা কথার সাথে এইসব কথা একেবারে মেলে না। বাবা আমাদের কাছে অবসর সময়ে টুকরো-টুকরো কথা শম্ভুনাথের সম্পর্কে বলতেন। তারপর আরও বড় হয়ে জানলাম সদর দেওয়ানি আদালতে নিম্নতম পদাধিকারী হয়ে যিনি জীবনযাত্রা শুরু করেছিলেন তিনিই কয়েক বছর পরে সেই সদর দেওয়ানি আদালতেই প্রথম দেশীয় প্রধান হিসাবে যোগদান করেছেন; শুধু তাই নয় আর্থিক দুরবস্থার জন্য যাঁকে স্কুলের তথাকথিত পড়াশুনা ছেড়ে দিতে হয়েছিল, পরবর্তীকালে তাঁকেই প্রেসিডেন্সি কলেজের 'ল প্রফেসর' নিযুক্ত করা হয়েছিল - এরকম এক ব্যক্তিত্ব শম্ভুনাথ যে আমাদের পূর্বসুরী, ভাবতেই রোমাঞ্চ হত - এরকম লোকই তো অনুকরণের যোগ্য। বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু আদর্শহীনতায় পীড়িত সমাজে, শম্ভুনাথের মতো চরিত্র আলোর দিশারী হয়ে যুবমানসে আলোকবর্তিকা স্বরূপ কাজ করবে বলে আমার বিশ্বাস। তাই তাঁর জন্মের ১৮৪ বছর বাদে তাঁর জীবনালেখ্য রচনায় ব্রতী হয়েছি। একজনও যদি তাঁর জীবনীপাঠে উৎসাহিত হয়ে জীবনের উন্নতিতে সচেষ্ট হন, তবেই আমার এই পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করব।

আমি গবেষক নই-লেখকও নই- ১৮৪ বছরের পুরানো তথ্য আহরণ করা রীতিমত শক্ত কাজ - কেবল মাত্র ভেতরের তাগিদের তাড়না এবং ছোটবেলা থেকে লালিত সুপ্ত বাসনার তীব্রতাই এই প্রৌঢ় বয়সে সুপ্তোত্থিত হয়ে আমাকে বাধ্য করেছে এই কাজে ব্রতী হতে। ঘুরে বেড়িয়েছি বিভিন্ন জায়গায় - বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে - বিভিন্ন লোকের কাছে - প্রায় প্রত্যেকের কাছেই উৎসাহ পেয়েছি। প্রতিষ্ঠান হিসেবে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ভারতীয় যাদুঘর, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা হাইকোর্ট, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, শ্রীরামপুরে কেরী লাইব্রেরি, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরি, কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরি, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি, বেনারস ক্যুইন্স কলেজ, লক্ষ্ণৌ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, কলকাতা ব্রাহ্ম সমাজ, কলকাতা আর্য সমাজ, আলিপুর সদর আদালত, প্রেসিডেন্সি কলেজ, বেথুন কলেজ, সিয়ারশোলের

(রানীগঞ্জ) রাজবাড়ী, লক্ষ্ণৌ কাশ্মীরি মহল্লা, কাশ্মীরি ভবন-সল্টলেক - কলকাতা, দিল্লির National Archive, ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী, শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল, বাগবাজার পাবলিক লাইব্রেরি প্রভৃতি জায়গায় কোথাও একবার, কোথাও বারবার হাজির হয়েছি তথ্যানুসন্ধানে। সমসাময়িক বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব হরিশ চন্দ্র মুখার্জি, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্যারীচরণ সরকার, পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, বাবু রামমোহন, ডিরোজিও, বিচারপতি দ্বারিকানাথ মিত্র, বাবু অনুকূল চন্দ্র মুখার্জি, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি যাঁদের সাথে শম্ভুনাথের ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল, তাঁদের জীবনী ও বিবিধ রচনা থেকে তথ্য আহরণ করার চেষ্টা করেছি। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা যতটা পাওয়া সম্ভব হয়েছে তা পাঠ করেছি কিছু পাবার আশায়।

তবে সবচেয়ে উৎসাহিত হয়েছি শম্ভুনাথের অধস্তন সহকারী দীনবন্ধু সান্যাল (যিনি নিজেকে তাঁর 'humble servant' বলে অভিহিত করেছেন) মহাশয়ের "Lecture on the life and character of the Hon'ble Shambhunath Pandit" পুস্তিকাটি পাঠ করে (যা বহরমপুরের Grant Hall এ ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮৬৮ শুক্রবারে উপস্থাপিত হয়েছিল এবং পরে উৎসর্গ করে ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে ছাপা হয়)। দেখা যায় পরে শম্ভুনাথ সম্পর্কীয় যে সমস্ত লেখা ছাপার অক্ষরে বেরিয়েছে এবং আমার দৃষ্টিতে এসেছে তার অধিকাংশ তথ্যই ঐ বক্তৃতার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। স্বভাবতই ঐ বক্তৃতায় উল্লিখিত বহু তথ্য, ঘটনা, পারিপার্শ্বিকতার বিচারে যা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়েছে তা আমার লেখাতেও ছাপ ফেলেছে।

সবচেয়ে পীড়াদায়ক, শম্ভুনাথের রচনাসমূহ "On being of God", পিয়ার্সনের বাক্যাবলী, বেকন সন্দর্ভের টীকা, ডিক্রী জারী আইন এবং সমসাময়িক পত্র পত্রিকায় লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধ কোথাও থেকে যোগাড় করা সম্ভব হয়নি। আমার আশা, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে যদি কোন কিছু রক্ষিত থাকে, তা দিয়ে সাহায্য করবেন যা পরবর্তী সংস্করণকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করবে।

বাবা আমাকে উদ্দেশ্য করে প্রায়শই বলতেন "আমার এই মেয়েটার জিহ্বার ধার এক্কেবারে জজবাবুর (শম্ভুনাথ আমাদের পরিবারে এই নামেই সম্বোধিত হতেন) মতো-" থাকতে না পেরে একদিন মুখের ওপর বাবুজীকে (বাবাকে আমরা এইভাবেই ডাকতাম) জিজ্ঞেস করে ফেললাম - "কেন একথা বলছেন ?" উত্তরে বাবা বললেন, "ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি উনি উচিত কথা বলতে কখনও কুণ্ঠিত হতেন না - সাথে সাথে উনি এও যোগ করলেন, তা বলে তোমার মতো এমন সারাক্ষণই তর্কযুদ্ধ করতেন না। যাঁরা উচিত কথা বলেন, - তাঁদের একটু কম কথা বলাই মানায়।" সাথে সাথেই আমার মনে একটা মুখ আঁকা হয়েগেল। জজবাবুর এমন কত যে মুখ আমার মনে গাঁথা হয়ে আছে। এখন জীবনী লিখতে

বসে যেন দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছি সব মুখেরই প্রতিফলন একটি মাত্র মুখের অবয়বে রূপান্তরিত হচ্ছে এবং একটি মুখে যেন সমস্ত মুখেরই আদল, মনে একটা অদ্ভুত আনন্দ অনুভূত হচ্ছে।

আর একদিনের কথা, বাবুজী বলছেন, "তোর সাথে যে ছেলেটা (পরবর্তীকালে আমার স্বামী যাঁর অবিরত উৎসাহ ও লেখায় সহযোগিতা না পেলে শম্ভুনাথের জীবনী লেখা আমার পক্ষে সম্ভবই হত না) আসে ওর সাথে যেন জজবাবুর কোথায় মিল - ছেলেটার স্মিতহাস্য মুখ আমায় খুব টানে।" পরবর্তী কালে দেখেছি ভেতরে সবকিছুকেই যুক্তিযুক্তভাবে গ্রহণ করার প্রবণতা যাদের আছে, তাদেরই এই রকম বহিঃপ্রকাশ হয় - অন্যভাবে শম্ভুনাথের জীবনী লিখতে গিয়ে যে সমস্ত পূর্ববর্তী লেখা আমার হস্তগত হয়েছে - এই স্মিতহাস্য মুখ কথাটা বারবার ওঁর সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন দিকের, বিভিন্ন জাতের, বিভিন্ন ভাষাভাষির, বিভিন্ন পদের লোকদের একত্রে টানার অন্যতম যাদুমন্ত্র শম্ভুনাথের এই স্মিতহাস্য মুখের আকর্ষণ।

শম্ভুনাথেব মৃত্যু হয় ৬ই জুন ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে। জীবদ্দশায় প্রচুর অর্থ উপার্জন করলেও দানধ্যান এবং আতিথেয়তার ফলে তিনি প্রায় কিছুই রেখে যেতে পারেননি। বিচারক পদে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি প্রায় সাড়ে চার বছর আসীন ছিলেন- ওকালতির মাসিক রোজগার ১৫০০০ টাকা ছেড়ে দিয়ে জজের পদে নিয়োজিত হয়েছিলেন মাত্র ৪০০০ টাকার মতো মাসিক বেতনে। সেই সময় বিভিন্ন খাতে তাঁর প্রতিশ্রুতি ছিল তাঁর আয়ের তুলনায় অনেক বেশী। সঞ্চিত টাকার সুদ এবং প্রাপ্ত মাস মাহিনায় যা বজায় রাখা সম্ভব হত না। ফলে তাঁর জমানো টাকায় নিয়মিত হাত পড়ত। তিনি অকালে মারা না গেলে হয়তো তাঁকে আর্থিক কষ্টেই পড়তে হত।

মারা যাবার সময় তাঁর বাঙ্গালী স্ত্রী হরিদাসী তাঁর দুই পুত্র সহ বেঁচে। কাশ্মীরি স্ত্রী স্বরূপরানীও তখন তাঁর দুই নাবালক পুত্র সহ বেঁচে আছেন। বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ আছে শম্ভুনাথ মারা যাবার আগের দিন একটি উইল করেছিলেন। কিন্তু তার কোন নকল কোন ভাবেই যোগাড় করা সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী অরুণ নেহেরুর মামা বিষেণ নারায়ণ তনখার কাছে উইলের একটি নকল আছে। সেটি পাবার আশায় লক্ষৌতে কয়েকবার যাতায়াত করেও লাভ হয়নি। তিনি মারা যাওয়ায় ওটা পাওয়ার আশা আর নেই বললেই চলে। তাঁর উত্তরসুরী লক্ষ্মৌর বাড়ী বিক্রি করে অন্য কোথাও আছেন। ঠিকানা যোগাড় করা সম্ভব হয়নি। শ্রী অরুণ নেহেরু শম্ভুনাথের মামাতো বোনের দিক থেকে অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। বিষেন নারায়ণ তনখার কাছে শম্ভুনাথ সম্পর্কীয় একটা ফাইল ছিল যা সর্বভারতীয় কাশ্মীরি সমাজের সভাপতির মাধ্যমে জানা যায়। উক্ত ফাইলটি খুঁজে বার করা সম্ভব হয়নি।

শম্ভুনাথের মৃত্যুর কয়েক বছর পর তাঁর ক্ষীয়মান সম্পত্তি নিয়ে শরিকি বিবাদ আরম্ভ হয়। মামলা মোকদ্দমা পর্যন্ত গড়ায়। এই মামলার নথি হাইকোর্টে প্রচুর ঘোরাঘুরি করেও যোগাড় করা সম্ভব হয়নি। যাই হোক শরিকি বিবাদের ফয়সালা কোর্টেই হয় - সম্পত্তির পরিমাণ কিভাবে কতটা কাদের মধ্যে বিতরিত হয়েছিল সঠিক তা জানা না গেলেও কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের পুরানো রেকর্ড ঘেঁটে জানা যায় শম্ভুনাথ স্ট্রীটের বসত বাড়ীটি বিভাজিত হয়েছিল - যার ৫৫ নম্বর দেওয়া অংশটি বাঙ্গালী স্ত্রী হরিদাসী, ৬১ এবং ৬২ নম্বর দেওয়া অংশটি হরিদাসীর দ্বিতীয় পুত্র শঙ্করনাথ এবং ৫৪ নম্বর দেওয়া অংশটি কাশ্মীরি স্ত্রী স্বরূপরানীর অধিকারে বর্তেছিল। স্বরূপরানী দীর্ঘায়ু ছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর নাতিগণ তাঁদের অংশ বিক্রয় করে একটি ধারা লক্ষ্ণৌতে এবং অন্য একটি ধারা পাটনাতে বসবাস করতে থাকেন। হরিদাসীর গর্ভজাত সন্তানগণের উত্তরাধিকারীগণ মূলত এখনও উক্ত বসতবাড়ীতে অবস্থান করছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ৬২ নম্বর বাড়িতেই সরলা দেবীর (দ্বারকানাথ ঠাকুরের দৌহিত্রী) বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় এবং এই বাড়িতে অবস্থিত ছাপাখানা থেকে আর্য্যসমাজ কর্তৃক বিভিন্ন পত্র পত্রিকা, গ্রন্থ ইত্যাদি প্রকাশিত হত।

শম্ভুনাথের জীবনীতে এমন কিছু প্রসঙ্গ এসেছে- যা আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু আমার মনে হয়েছে একজন লোককে সম্যকভাবে বুঝতে গেলে, তাঁর পারিপার্শ্বিকতা (দেশ, কাল, সমাজ, পেশা, জাতি, বাসস্থান) সম্পর্কীয় একটা মোটামুটি ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। আমি তার একটা আভাস দিতে চেষ্টা করেছি।

জীবনী লিখতে গিয়ে বিভিন্ন পত্র, পত্রিকা, বিভিন্ন সমসাময়িক ব্যক্তিত্বের জীবনী, ব্যক্তিগত চিঠি ইত্যাদির ওপর নির্ভর করতে হয়েছে, যা পারিপার্শ্বিকতার বিচারে এবং পারিবারিক বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে আলোচিত তথ্যের ওপরে নির্ভর করে বইতে সন্নিবেশিত হয়েছে - তবুও যদি কারও কাছে প্রামাণ্য কিছু ভিন্নতর তথ্য থাকে, তা পাওয়া গেলে পরবর্তী সংস্করণে সংযোজিত হতে পারে।

যাঁর জীবনী রচনায় ব্রতী হয়েছি, তিনি বিপদে অকুতোভয়, চার কৃতী সন্তানের জনক এবং নিজে আনন্দ করার চেয়েও চারপাশের সকলকে বেশী আনন্দ দিতে চেয়েছেন এবং সেই আনন্দ উপভোগ করেছেন, অথচ এহেন ব্যক্তিত্বের অদ্যাবধি কোন প্রামাণ্য জীবনী রচিত হয়নি-তা সত্যি বিস্ময়কর। লিখতে বসে কেবলই মনে হচ্ছে - তাঁর সম্বন্ধে মৌলিক তথ্য আরও কিছু পাওয়া গেলে ভাল হত। ভবিষ্যতে সুযোগ হলে নিশ্চিত তা উপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশিত হবে, এই আশা নিয়ে বর্তমান প্রচেষ্টার সাময়িক যতি টানছি।

চিন্ময়ী পণ্ডিত দত্ত

লেখকের কথা (২)

উনবিংশ শতাব্দী বাংলা এবং বাঙালীর জীবনে এক বিশেষ অধ্যায়— দিকে দিকে নতুন নতুন সাড়া জাগানো উদ্যম, ঘরে ঘরে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব— শিক্ষায়, সাহিত্যে, ধর্মে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, রাজনীতিতে, ব্যবসা বাণিজ্যে, স্বাধীনতা সংগ্রামে, মননশীলতায়, প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলা ভারতবর্ষকে পথ দেখাচ্ছে। এমন একটা সময়ে কলকাতায় শম্ভুনাথের জন্ম। সাধারণ অবস্থা থেকে তিনি যে উচ্চতায় পৌঁছেছেন তা সর্বজনের অনুকরনের যোগ্য। তাঁর বৈচিত্রময় জীবনে চারিত্রিক বিশুদ্ধতা, যে কোন সংবেদনশীল মানুষের কাছে আদর্শ স্বরূপ — যা আমাকেও অনুপ্রাণিত করেছে এই জীবনী রচনায়।

পূর্বপুরুষের বাসভূমি, বাল্যকাল ও শিক্ষা, গার্হস্থ্য / ব্যবহারিক জীবন, তিরোধান, চারিত্রিক বিশিষ্টতা / চরিত্রায়ণ ও স্মৃতি রক্ষণ — এই কটি অধ্যায়ে শম্ভুনাথের জীবন চিত্রিত হয়েছে। জীবনীটি সম্যকভাবে উপলব্ধি করার জন্য এই বই এর মধ্যে এসে গেছে কাশ্মীরের পট পরিবর্তনের কথা, বিচার ব্যবস্থার ক্রমবিবর্তন এবং আইন ব্যবসার উৎপত্তির কথা, তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার কথা যা আপাতদৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। জজ হিসাবে নিয়োজিত হবার পর এবং তিরোধানের পর তৎকালীন পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু উল্লেখযোগ্য প্রাসঙ্গিক অংশ পরিশেষে সন্নিবেশিত হয়েছে। তিরোধানের পর কলকাতায় এক বিশাল মহতী স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণী হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা পুস্তিকাগারে প্রকাশ করে যা এই বই এর পরিশিষ্টাংশে দেওয়া হয়েছে। শম্ভুনাথের বানান ইংরাজীতে বিভিন্ন যায়গায় বিভিন্ন রকম ভাবে লেখা হয়েছে, উদ্ধৃতি উপস্থাপনায় তা অপরিবর্তিত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

জীবনী রচনার কাজে বহু মানুষের কাছ থেকে বহুরকম সাহায্য পেয়েছি— তাঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, স্থানাভাবে তাঁদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে দু-এক জনের কথা না বললেই নয়, বন্ধুবর শ্রী অমিত রায়, (এডভোকেট), যাঁর উপদেশ এবং পথনির্দেশ ছাড়া জীবনী রচনার কাজে হাত দেওয়া সম্ভবই হত না, বন্ধুবর নূপুর শিঞ্জন ভট্টাচার্য্য (লেখক), শ্যামল কুমার রক্ষিত (প্রধান শিক্ষক) এবং সজল কুমার ঘোষ (অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সেসান জজ), যাঁরা বিভিন্নভাবে, বিশেষ করে ক্লান্তিকর প্রুফ সংশোধনের কাজে দারুনভাবে সাহায্য করেছেন, আমার মেয়ে কুমারী শীলাঞ্জনা বই এর সুন্দর প্রচ্ছদপটটি এঁকে দিয়েছে, সর্বজন শ্রদ্ধেয় দেবতুল্য মানুষ মাননীয় জাষ্টিস শ্রী চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায় এবং বহু পুস্তক রচয়িতা ও বহু ছাত্রছাত্রীর পথ প্রদর্শক শ্রী সুনীল কুমার চ্যাটার্জীর অবিরাম উৎসাহ না পেলে হয়তো আমাদের একাজ সম্পূর্ণই হত না।

মাননীয় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষা, সমাজকল্যান ও সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রী প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র তাঁর অমূল্য সময় ব্যয় করে একটি সুন্দর ভূমিকার অবতারণা করে আমাদের চিরঋণী করেছেন।

অমলেশ চন্দ্র দত্ত

পিতৃপুরুষের বাসভূমি

তখন কাশ্মীর জলের তলায়- বরফচূড়ায় পাহাড় ঘেরা একটা বিরাট হ্রদ - নাম সতীসর- সেখানে বাস করে জলোদ্ভব নামে এক অসুর - তার খাদ্য পাহাড়ে বসবাসকারী সাপ। জলে অজেয় জলোদ্ভবের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে তারা ঋষি কাশ্যপের শরণাপন্ন হল। ঋষি তাঁর ত্রিশূল দ্বারা পশ্চিমদিকের পাহাড়ের তলদেশ দিয়ে ছিদ্র তৈরি করলেন, যার মধ্য দিয়ে হ্রদের সমস্ত জল বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে এল অসুর জলোদ্ভব - বিষ্ণুর চক্রে দ্বিখণ্ডিত হল তার দেহ। জলের তলা থেকে জেগে উঠল উপত্যকা কাশ্মীর - কাশ্যপপুরের অপভ্রংশ। এমন আরও অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে কাশ্মীর নিয়ে। সমতলবাসীরাই ধীরে ধীরে কাশ্মীরকে বাসস্থান করে নিয়েছিল। তবে কাশ্মীরের জনপদ যে প্রাচীন গ্রিক, রোমান, পার্সীয়ান এবং ভারতের বিভিন্ন অংশের জনগণের মিশ্রণ তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখানে মিশ্রিত বাঙালী জাতির সাথে কাশ্মীরিদের মিল লক্ষণীয়। খ্রিষ্টপূর্ব তিনশত বৎসরে রাজা অশোকের সময় থেকে কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্ম প্রাধান্য পেতে আরম্ভ করে। ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্ম তার একটা ছাপ রেখে, মাথা-তোলা হিন্দু ধর্মের সামনে পিছিয়ে পড়ে। হিন্দু রাজারা ১৩২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কাশ্মীর শাসন করেন। কাশ্মীরে মুসলিম শাসনের বহু পূর্বেই সুফী সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রচারকগণ দ্বাদশ শতাব্দীতে কাশ্মীরে মুসলমান হিসাবে প্রথম পা রাখেন। অলৌকিকক্ষমতা সম্পন্ন এই সুফীগণ পরে কবি এবং ফকির হিসাবে সহজেই ধীরে ধীরে সাধারণের মন জয় করেন। ১৩২১ খ্রিষ্টাব্দে জ্ঞানালোক প্রাপ্ত বিখ্যাত সুফী বুলবুল শাহ কাশ্মীরে আসেন। তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা এবং অদ্ভুত জীবনযাপনে হিন্দু রাজা রিনচেন আকৃষ্ট হন এবং তাঁর কাছেই মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত হন। রিনচেনই কাশ্মীরে প্রথম মুসলিম রাজা (১৩২১)।

এরপর আশ্চর্য্যজনকভাবে কাশ্মীরের পট পরিবর্তন হতে থাকে - কাশ্মীরের এই পরিবর্তন চোখে পড়ার মতো - যা খুবই মর্মান্তিক।

১৩২২ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কীস্থানের জুলকাদের খান কাশ্মীর আক্রমণ করে এবং প্রায় এক হাজার কাশ্মীরি পণ্ডিতকে হত্যা করে, বহু লোককে তরবারির সামনে রেখে তার মতে পরিবর্তিত করে। এখানেই ক্ষান্ত না হয়ে অবাধে লুঠতরাজ করে ফেরার পথে প্রায় পঞ্চাশ হাজার কাশ্মীরি পণ্ডিতকে দাস হিসাবে তুর্কীস্থানে ব্যবহার করার জন্য সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করে - তবে পথিমধ্যে বার্যাগঞ্জান নামক হিমালয়ের তরাইয়ে তুষার ঝড়ে সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এরপর সিকান্দার বুৎসিকাকের রাজত্বের (১৩৮৯ - ১৪১৩) শেষে মাত্র কয়েকটি কাশ্মীরি পণ্ডিত-পরিবার তাদের স্বকীয়তা নিয়ে অতিকষ্টে কাশ্মীরে রয়ে

গিয়েছিলেন। এই কাণ্ডের জন্য প্রধান দায়ী সিকান্দারের মুখ্যমন্ত্রী, মালিক সইফুদ্দিন (পূর্ব নাম সুহা ভার্দ) যিনি হিন্দু থেকে মুসলিমে ধর্মান্তরিত হয়ে ছিলেন। নির্দোষ কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ওপর তার অত্যাচার ছিল বর্বরোচিত, নৃশংস। সিকান্দারই এই জাতিকে মল্‌মাসী (আদি বাসিন্দা) এবং বনমাসী (দক্ষিণ থেকে আসা) এই দুটি ভাগে বিভক্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

কিন্তু পিতার বিপরীত চরিত্রের ছিলেন সিকান্দারের পুত্র শাহী খান (১৪২০ - ৭০)-তাঁর ৫০ বছরের রাজত্বকালকে কাশ্মীরের সুবর্ণযুগ বলা হয়ে থাকে। যদিও তিনি ছিলেন মুসলমান, তবু হিন্দুদের সমস্ত অনুষ্ঠানে সর্বতোভাবে অংশ নিতেন। তাঁর এই কার্যকলাপ পরবর্তী শাসকদের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছিল। সেই সময় বিভিন্ন কারণে বহু হিন্দু, ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। এইভাবে ধীরে ধীরে হুসেন শাহ চকের (১৫৬৩-৭০) রাজত্বকালের মধ্যে কাশ্মীরে জনসংখ্যার বেশির ভাগই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল।

আকবর কাশ্মীর জয় করেন ১৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দে। এই সময় থেকে কাশ্মীরে শুরু হয় মোঘল শাসন। এরপর আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে (১৬৫৮ - ১৭০৭) ইফতিখার খানকে (১৬৭১ - ১৬৭৫) কাশ্মীরের সুবেদার হিসাবে নিয়োগ করা হয়। ইফতিখার যখন কাশ্মীরি পণ্ডিতদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা ও ধর্মান্তর করতে আরম্ভ । তখন বহু কাশ্মীরি পণ্ডিত কাশ্মীর থেকে রাতের অন্ধকারে গভীর বনাঞ্চল করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে চলে আসেন।

এইভাবে বারে বারে অত্যাচারিত হয়ে কাশ্মীরি পণ্ডিত সম্প্রদায় ভারতের বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন সময়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। যে সমস্ত শহরে তখন কাশ্মীরি পণ্ডিতগণ আশ্রয় নিয়েছিলেন তার মধ্যে লাহোর, দিল্লী, আগ্রা, জয়পুর, যোধপুর, কানপুর, ফৈজাবাদ, এলাহাবাদ এবং লক্ষ্ণৌ প্রধান।

এরপর আহমেদ শাহ আবদালী ১৭৫৩ খ্রিষ্টাব্দে কাশ্মীর আক্রমণ করেন এবং জয় করেন - আরম্ভ হয় কাশ্মীরে আফগান শাসন। আফগান শাসনে (১৭৫৩ - ১৮১৯) বিশেষভাবে লালখান কট্টয়ক, ফকিরুল্লা এবং জব্বর খান এর আমলে তাদের বর্বরোচিত আচরণের ফলে বহু কাশ্মীরি পণ্ডিত দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন - প্রধানত ধর্মান্তরিত হওয়ার ভয়ে। এঁদের মধ্যে শম্ভুনাথের পূর্বপুরুষও ছিলেন।

আফগান শাসনে, কাশ্মীরে চলেছে অবাধ লুঠতরাজ, অত্যাচার, দাসত্ব, শোষণ - ফলে কাশ্মীরিরা গোপনে পাঞ্জাবের বিশিষ্ট শাসক রঞ্জিত সিং এর সাহায্য চাইলেন। ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দে আফগানরা পরাজিত হলেন - শুরু হল কাশ্মীরে শিখ শাসন। যা ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কায়েম ছিল। এরপর কাশ্মীরে ডোগরা শাসন চালু হয় - যা প্রায় ১০০ বৎসর চালু ছিল।

বংশ পরিচয়

এটা স্বীকৃত সত্য যে চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত কাশ্মীর উপত্যকার বাসিন্দা মূলতঃ হিন্দুই ছিলেন। এরপরে তুর্কী আক্রমণের পর থেকে ধর্মান্তরকরণ শুরু হয় যা সিকান্দারের রাজত্বের সময় সাংঘাতিকভাবে বেড়ে যায়। কিন্তু সিকান্দারের ছেলে শাহীখানের আমলে তাঁর বিশেষ গুণাবলীতে বিশেষ করে তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতায় আকৃষ্ট হয়ে বহু হিন্দু স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল, অবশ্য এর পেছনে রাজ দরবারে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের গুরুত্ব থাকায় তা যে সাধারণের ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রবণতা হিসাবে কাজ করেছিল তা অস্বীকার করা যায় না। এরকম ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়া হুসেন শা চকের রাজত্বকাল পর্যন্ত চলেছিল, যেহেতু শাহী খানের পরবর্তী শাসকগণও তাঁর আদর্শ, ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রেখে চলতে পেরেছিল। কিন্তু এরপর বারে বারে কাশ্মীরে হিন্দুদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে, তাদের লুণ্ঠন করা হয়েছে এবং ধর্ম্মান্তরিত অথবা হত্যা করা হয়েছে, তার ফলে প্রচুর কাশ্মীরি পণ্ডিত দেশত্যাগী হন। কথিত আছে এক সময় মাত্র এগারোটি কাশ্মীরি হিন্দু পরিবার কাশ্মীর উপত্যকায় অবশিষ্ট ছিল। তাদের উত্তরসুরীদের মল্‌মাস নামে অভিহিত করা হয়। এরপর যারা দাক্ষিণাত্য থেকে কাশ্মীরে বসবাস করতে অনুপ্রবেশ করেছিল তাদের বনমাস বলে অভিহিত করা হয়। কাশ্মীরি ব্রাহ্মণগণ পণ্ডিত বলেই পরিচিত। তারা মুচি, কুমোর, ভুজিওয়ালা, কুলি, ছুতোর, রাজমিস্ত্রি অথবা ফুলওয়ালা ছাড়া আর সমস্ত পেশাতেই নিয়োজিত হতো। তাদের দুর্বলতা গণিতশাস্ত্রে। পণ্ডিতগণ ছিলেন সুদর্শন, সুন্দর মুখশ্রীযুক্ত, নাতিদীর্ঘ হাত পা এবং চটকদার আকৃতির। স্ত্রীলোকেরা সুন্দরী। শিশুরা চিত্তাকর্ষক।

পণ্ডিতগণ বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত। ১৮টি প্রচলিত গোত্র। বনমাস পণ্ডিতদের মধ্যে একটি গোত্র দত্তাত্রেয়।

এই দত্তাত্রেয় গোত্র শ্রেণীভুক্ত শম্ভুনাথের পূর্বপুরুষগণ বহুবছর কাশ্মীরে বসবাস করেছিলেন। যতদূর জানা যায় বর্তমান কাশ্মীরের বহু আলোচিত স্থান বাবামূলা অঞ্চলে তাঁদের বসবাস ছিল। এই অঞ্চল ছেড়ে সম্রাট শাহ্ আলমের (১৭৫৯ - ১৮০৮) সময়ে জীবন এবং ধর্মরক্ষার তাগিদে শম্ভুনাথের পিতামহ মনসারাম কিছু আত্মীয়বন্ধুর সাথে দিল্লীতে এসে হাজির হন। দিল্লীতে রুজি রোজগারের বিশেষ ব্যবস্থা না করতে পেরে দিল্লীতে কিছুদিন থাকার পরে অযোধ্যায় চলে আসেন এবং কোন এক আত্মীয়ের সহায়তায় মহারাজার দরবারে এক বেতনভুক কর্মচারী হিসাবে নিয়োজিত হন। তথায় তিনি সুনামের সাথে বেশ কিছুদিন কাজ করার পর সেখানে বেশ কিছু বিত্ত সম্পত্তি অর্জন করেন। কিন্তু সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগ আরম্ভ হয় তাঁর কিছু আত্মীয়ের সঙ্গে, যাঁরা তখন সেখানেই বসবাস করছিলেন। নির্বিরোধী মনসারাম সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে আত্মীয়দের দাবি মিটিয়ে অবশিষ্ট সম্পদ নিয়ে চলে আসেন লক্ষ্ণৌতে। তখন লক্ষ্ণৌতে বহু কাশ্মীরি পণ্ডিত বসবাস

মনসারামের দুই ছেলে, বড় সদাশিব এবং ছোট শিবপ্রসাদ। ছোট ছেলে শিবপ্রসাদেরই ছেলে শম্ভুনাথ। শম্ভুনাথের পিতার নাম বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমে উল্লেখিত হয়েছে। যেমন শম্ভুনাথের কাছের মানুষ শিষ্যপ্রতিম দীনবন্ধু সান্যাল মহাশয় তাঁর পিতার নাম সদাশিব বলে উল্লেখ করেছেন। আবার শম্ভুচন্দ্রের 'চরিতমালা' পত্রিকায় শম্ভুনাথ মারা যাবার পর শোকবার্তায় তাঁর পিতার নাম উল্লেখ করা হয়েছে শিবনারায়ণ বলে। আবার 'সেকালের কৃতী বাঙ্গালী' পুস্তকে শম্ভুনাথের সহপাঠী ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষের পৌত্র মন্মথ নাথ ঘোষ তাঁর বাবার নাম উল্লেখ করেছেন সদাশিব বলে। আবার আমরা দেখি শম্ভুনাথের বিশেষ বন্ধু গোবিন্দ প্রসাদ বোস এক জবাবী চিঠিতে শম্ভুনাথের পুত্র প্রাণনাথকে লিখছেন শম্ভুনাথের পিতার নাম শিবপ্রসাদ বলে। অন্যান্য অনেক স্থলেই এই নাম বিভ্রাট দৃষ্টিগোচর হয়েছে। সমস্ত দিক পর্যালোচনা করে মনে হয়েছে শম্ভুনাথের পিতার নাম ছিল শিবপ্রসাদ এবং তাঁর পিতৃব্য যিনি শম্ভুনাথকে জন্মের পরেই দত্তক নিয়েছিলেন তাঁর নাম ছিল সদাশিব। মনে হয় পালিত পিতা হিসাবে সদাশিবকেই বিভিন্ন জায়গায় পিতা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

মনসারাম তাঁর ছোট ছেলে শিবপ্রসাদের বিবাহ দেন এক বর্ধিষ্ণু শিক্ষিত পরিবারে। লক্ষ্ণৌ কাশ্মীরি মহল্লায় অবস্থিত কোন এক বাড়ীতে তাঁরা বসবাস করতেন। শিবপ্রসাদ লক্ষ্ণৌতে থাকাকালীন ফার্সী এং উর্দু দুই ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। বিবাহোত্তর কালে তিনি কিছুদিনের জন্য বেনারসে গিয়েছিলেন চাকরি বা রোজগারের আশায়। সেখানে বিশেষ সুবিধা হয়নি। ইতিপূর্বেই শিবপ্রসাদের দাদা জীবিকার সন্ধানে হাজির হয়েছিলেন কলকাতায়। ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশী যুদ্ধ জয়ের পর ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে জয়ী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কলকাতাকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে শক্তি বাড়াতে আরম্ভ করে এবং যা ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে মহাবিদ্রোহ দমনের পর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় কলকাতায় জীবিকার সন্ধানে বহিরাগতের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এদের সাথেই সামিল হন শিবপ্রসাদের দাদা সদাশিব। উনি কলকাতায় এসে সদর দেওয়ানী আদালতে পেসকার পদের একটি চাকরি জোগাড় করতে সমর্থ হন। লক্ষ্ণৌতে থাকাকালীন শিবপ্রসাদের মতো তার দাদাও ফার্সী এবং উর্দু এই দুই ভাষাতেই জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। এরই সুবাদে তাঁর সদর দেওয়ানি আদালতে চাকরি পেতে অসুবিধা হয়নি। শিবপ্রসাদ বেনারসে বিশেষ সুবিধা করতে না পারায় দাদার শরণাপন্ন হয়ে তাঁর কাছেই চলে আসেন। নিঃসন্তান সদাশিব ছোট ভাইকে খুবই স্নেহ করতেন এবং দুই ভাইয়ের মধ্যে খুবই অন্তরঙ্গতা ছিল। সদাশিব সর্বদাই ভাইকে কাছে রাখতে উৎসাহী ছিলেন। শিবপ্রসাদ কলকাতা আসায় তাঁর সেই ইচ্ছা-পূরণ হয়েছিল। তাঁর আন্তরিক চেষ্টায় উর্দু ফার্সী জানা শিবপ্রসাদের, তাঁর কর্মস্থল সদর দেওয়ানি আদালতেই চাকরি যোগাড় করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। শিবপ্রসাদ চাকরি পাওয়ার পর কলুটোলা স্ট্রীটে বাসা নেন। শিবপ্রসাদ সেরেস্তার নায়েব হিসাবে বহুদিন সদর দেওয়ানি আদালতে নিযুক্ত ছিলেন। শিবপ্রসাদের দুই ছেলে। বড় শম্ভুনাথ, ছোট অম্বরনাথ এবং এক মেয়ে।

বাল্যকাল ও শিক্ষা

শম্ভুনাথের জন্মস্থান সম্বন্ধেও বিতর্ক আছে। কারো কারো মতে শিবপ্রসাদ বেনারসে থাকাকালীন বেনারসেই শম্ভুনাথের জন্ম হয়। আবার কারো কারো মতে শিবপ্রসাদ কলকাতায় আসার পর কলকাতাতেই শম্ভুনাথের জন্ম। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, শম্ভুনাথের জন্ম কলকাতাতেই। বেনারস থেকে দাদার আগ্রহে এবং পরামর্শে কলকাতায় এসে চাকরি যোগাড়ের পূর্বেই দাদার কাছে থাকাকালীন শিবপ্রসাদের প্রথম সন্তান শম্ভুনাথের জন্ম। একদিকে আর্থিক অনটন অন্যদিকে নিঃসন্তান দাদার আগ্রহ ও তাঁর প্রতি অপত্যস্নেহই উদ্বুদ্ধ করে শম্ভুনাথকে তাঁর কাছে দত্তক দিতে।

শম্ভুনাথের জন্ম হয় ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি যেন সাথে করে কিছু মন্দভাগ্য নিয়েই জন্মেছিলেন। জন্মের পরে মা বাবার আদরেই মানুষ সাধারণত বড় হয়। শম্ভুনাথের ক্ষেত্রে তা হয়নি। হয়তো বেশি আদর যত্নই পেয়েছেন অপুত্রক পিতৃব্যের কাছে। তবুও মা বাবা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তাঁদের আদর থেকে তিনি বঞ্চিত। কারণ জন্মের পর পরই পিতৃব্য তাকে দত্তক নিয়েছিলেন। আবার দত্তক নেওয়ার দু বছরের মধ্যে পরপর জ্যাঠা এবং জ্যাঠাইমার মৃত্যুতে তাঁকে আবার বাবার কাছে ফিরে আসতে হয়। একটা অভ্যস্ত জীবন থেকে শিশু শম্ভুনাথকে সরে আসতে হয়। বাবার কাছে এসে তাঁর শরীর বিশেষ ভাল যাচ্ছিল না। ঠাণ্ডায় শ্বাসকষ্ট হওয়ায় ডাক্তারের পরামর্শে শুষ্ক আবহাওয়ার জন্য মামার বাড়ী লক্ষ্ণৌ পাঠানো হল তাঁকে। মা বাবার স্নেহ বঞ্চিত হয়ে আবার তাঁকে বেশ কয়েক বছর কাটাতে হয় তাঁর মামার বাড়ীতে। অবশ্য মামার বাড়ীতেও তিনি খুব আদরেই ছিলেন। মামা ছিলেন বিদ্বান, বিচক্ষণ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ব্যক্তিগত বিশেষ নজরও রাখা হত শম্ভুনাথের ওপর। যা হোক এরকম দ্রুত স্থান এবং পরিমণ্ডল পরিবর্তনজনিত কারণেই মনে হয় ভেতরে ভেতরে শম্ভুনাথের আসল অন্তর্মুখী চরিত্র গড়ে উঠতে থাকে। স্পর্শকাতর নিঃসঙ্গ মন এরকম অবস্থায় কাউকে কাউকে অমানুষ করে তোলে, আবার কাউকেকরে তোলে বিশিষ্ট। রবীন্দ্রনাথ, শ্রী অরবিন্দ, অতুলপ্রসাদ প্রভৃতি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মনে হয় শম্ভুনাথের অতিমানবীয় চরিত্রের একটি উপাদান এই পরিস্থিতি।

তিনি লক্ষ্ণৌ নগরীতে মামার বাড়ীতেঅবস্থানকালে সেখানকার স্কুলে উর্দু এবং ফার্সী ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। লক্ষ্ণৌ থেকে কলকাতা আসার মধ্যে তিনি কিছু সময়

বারানসীতে ইংরেজী শিক্ষালাভ করেছিলেন। কাজেই বলা যায় কলকাতা স্কুলে ভর্তি হবার আগেই তিনি উর্দু, ফার্সী এবং ইংরেজী ভাষা শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তিনি এই ভাষাগুলিতে আরও পরিণত হয়েছিলেন মামার বাড়ীতে, মামার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং মামার বাড়ীতে পড়াশুনো করার সুযোগ থাকার সুবাদে। অধ্যয়ন মনস্ক শম্ভুনাথও এই সুযোগ পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগিয়েছিলেন। যেসময়ে মানুষের চরিত্র গঠনের ভিত গড়ে ওঠে (৫/৬ বছর বয়স থেকে ১৪/১৫ বয়স পর্যন্ত) জীবনের সেই সময়ে শম্ভুনাথ মামার বাড়ীতে লক্ষ্ণৌ নগরীতে কাটিয়েছিলেন। ফলে মামার চরিত্রেরও একটা সুস্পষ্ট ছাপ শম্ভুনাথের ওপর পড়েছিল। মামা ফার্সী এবং উর্দু উভয় ভাষাতেই জ্ঞানার্জন করেছিলেন। ফলতঃ শম্ভুনাথও এই ভাষাগুলিতে ভাল শিক্ষালাভ করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

লক্ষ্ণৌতে মামার বাড়ী ছিল কাশ্মীরি মহল্লায় যা এখনও বর্তমান, তবে তা এখন আকারে প্রকারে পরিবর্তিত হয়েছে। ঐ মহল্লায় অনেক খোঁজাখুঁজি করেও মামার বাড়ীটা সনাক্ত করা যায়নি। কাশ্মীরি এসোসিয়েশান, লক্ষ্ণৌ এর সভাপতি এবং সর্বভারতীয় কাশ্মীরি সমাজের ভাইস প্রেসিডেন্ট, লক্ষ্ণৌ কাশ্মীরি মহল্লা নিবাসী ইতিহাসবিদ ডাঃ বি. এন. সরগাও এ ব্যাপারে অনেক মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত কৃতকার্য হননি। তবে ওখানে ঘোরাঘুরিতে একটা জিনিষ পরিষ্কার হয়েছে যে তখন কাশ্মীরি মহল্লার প্রতিটি বাড়ীই ভেতর ভেতর যুক্ত ছিল। মনে হয় বাইরের শত্রুর মোকাবিলা করার জন্যই হোক বা পলায়নের / লুকিয়ে থাকার জন্যই হোক এরকম ব্যবস্থা হয়েছিল। এতে কমিউনিটি হিসাবে অনুভূতিও প্রবল হয়। বিভিন্ন কারণে তখন লক্ষ্ণৌ খুব অশান্ত ছিল। নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদেই এইরকম ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছিল এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বালক শম্ভুনাথ এরকম একটা পরিবেশে বেড়ে ওঠার দরুন তাঁর ওপর এর প্রভাব ছিল অপরিসীম। উত্তরজীবনে তিনি প্রায় প্রতি বছরই লম্বা ছুটির অবকাশে লক্ষ্ণৌতে ছুটে আসতেন। মামা তো ছিলেনই, অন্যান্য পরিচিতজনদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ এবং সুখ-দুঃখের আদান-প্রদান করার জন্য লক্ষ্ণৌ ছিল যেন তাঁর আপন দেশ। পরে ছেলের বিয়েও দিয়েছেন লক্ষ্ণৌতে। তখন লক্ষ্ণৌ যাওয়া খুবই কষ্টকর ছিল। জলপথই প্রধান ভরসা ছিল। এতদ্সত্ত্বেও প্রায় প্রতিবছরই শম্ভুনাথ লক্ষ্ণৌতে যেতেন এবং সেখানে তাঁর পরিচিত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন বহু ছিল। ছেলের

বিবাহ উপলক্ষে তিনি লক্ষ্ণৌতে একটা উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। শোনা যায় উনি তাতে চার লক্ষ টাকা খরচ করেছিলেন। এমন জাঁকজমকপূর্ণ উৎসবের কথা বহুদিন লোকের মুখে মুখে ফিরত। তিন দিন ধরে চলা এই অনুষ্ঠানে কোন প্রকার আনন্দ করবার উপকরণই বাদ যায়নি। এই অনুষ্ঠানে গণ্যমান্য অতিথি ছাড়াও বহু সাধারণ মানুষও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

মা-বাবার থেকে দূরে থাকার ফলে যে কোন মানুষের মনেই একটা অভিমান তৈরি হয়, যা ভাবুক মনকে অন্তর্মুখী করে তোলে। শম্ভুনাথও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাঁর চিন্তার ক্ষেত্রে ঋজুতা, স্বচ্ছতা, সাযুজ্যতা ও গভীরতার অনুপ্রবেশের আঁতুড় ঘর যেন তাঁর এই লক্ষ্ণৌবাস।

শম্ভুনাথ তাঁর চোদ্দ বছর বয়সে ১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দে মামার বাড়ী থেকে কলকাতায় বাবার কাছে ফিরে আসেন। তখন তাঁর শরীর স্বাস্থ্য খুবই সতেজ। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, মনে দৃঢ় সঙ্কল্প কিছু করার।

কলকাতায় একটু বেশি বয়সেই শম্ভুনাথ স্কুলে ভর্তি হন। তিনি চোদ্দ বছর বয়সে ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে ভর্তি হয়েছিলেন। তবে মন্মথ নাথ ঘোষের লেখা 'সেকালের কৃতী বাঙালী' বইতে শম্ভুনাথ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লেখা হয়েছে "ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে ভর্তি হওয়ার পূর্বে অল্পকাল শম্ভুনাথ হেয়ার সাহেবের বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে"। তখন হেয়ার সাহেবের স্কুলে ছাত্রদের এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া হত যেন ছাত্রগণ হিন্দু স্কুলে ভর্তি হতে পারে। তখন এই স্কুলকে হিন্দুস্কুলের প্রিপারেটরি স্কুল বলে অনেকে অভিহিত করেছেন। যাহোক তিনি যে ১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে পড়াশুনা করেছিলেন তাতে দ্বিমত নেই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই কলকাতাকে কেন্দ্র করে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত গড়ে উঠছিল। নিজেদের দরকারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃপক্ষ ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দ খুলেছিল কলকাতা মাদ্রাসা। ১৭৯২ খ্রিষ্টাব্দে খোলা হয়েছিল বারানসী সংস্কৃত কলেজ এবং ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। ১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দের Letter patent আইনানুযায়ী, ভারতবর্ষে কোম্পানির উদ্বৃত্ত রাজস্ব থেকে বছরে অন্তত এক লক্ষ টাকা শিক্ষাবাবদে খরচ করা হবে এই মর্মে কোম্পানি এক প্রস্তাব নেয়। কিন্তু শিক্ষা বিস্তারের জন্য এর পরেও অনেক বছর সেরকম কিছু খরচ করা হয়নি। তবে তখন বেসরকারি উদ্যোগে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য কিছু করার চেষ্টা হচ্ছিল। এরকম একটা সময়ে ডেভিড হেয়ার একটা শিক্ষালয় স্থাপন করার পরিকল্পনা করেন।

এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় তদানীন্তন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এড্ওয়ার্ড হাইড ঈস্টের সাহায্য চাইলেন। তাঁরই উদ্যোগে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে ১৪ই মে এবং ২১শে মে ১৮১৬ খ্রিষ্টাব্দে পর পর দুটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং একটি কলেজ স্থাপন করার প্রস্তাব গৃহীত হয় যার নাম হিন্দু কলেজ রাখার প্রস্তাব লওয়া হয়। দশজন ইউরোপীয় (স্যার এডওয়ার্ড হাইড ঈস্ট, জন হার্বার্ট হ্যরিংটন, ডব্লু সি ব্লাকিয়ার, জে. এইচ টেলর, হোরেস হেম্যান উইলসন, এন্ ওয়ালিচ, উইলিয়াম ব্রাইস, ডি. হিমিং, ইসাস রোবাক ও ফ্রান্সিস আর্ভিন) এবং কুড়ি জন হিন্দু (রাধাকান্ত দেব, গোপীমোহন দেব, গোপীমোহন ঠাকুর, হরিমোহন ঠাকুর, পণ্ডিত চতুর্ভূজ ন্যায়রত্ন, সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, তারাপ্রসাদ ন্যায়ভূষণ, রঘুমণি বিদ্যাভূষণ, জয়কৃষ্ণ সিংহ . রায়তনু মল্লিক, অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাম দুলাল দে (সরকার), রাজা রায়চঁাদ, রামগোপাল মল্লিক, বৈষ্ণব দাস মল্লিক, চৈতন্যচরণ শেঠ, কালীশঙ্কর ঘোষাল, শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ও রামরত্ন মল্লিক) মোট এই তিরিশ জন সদস্য নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর তের হাজার টাকা দান করেন কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য। কলেজের হিন্দু সম্পাদক হলেন দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং ইউরোপীয় সম্পাদক ফ্রান্সিস আর্ভিন। হিন্দু কলেজ দু- ভাগে বিভক্ত - স্কুল বা পাঠশালা এবং কলেজ। ২০শে জানুয়ারী ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে কুড়িজন ছাত্র নিয়ে গোরাচাঁদ বসাকের বাড়ীতে হিন্দু কলেজের যাত্রা শুরু যা তারপর চিৎপুরে রূপচরণ রায়ের বাড়ী হয়ে জোড়াসাঁকোর কমল ঘোষের বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়।

আদর্শ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত মানের পুস্তকের প্রয়োজন মেটানোর জন্য ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে ৪ জুলাই বাঙ্গালী ও ইংরেজদের নিয়ে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান "কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি"র জন্ম হয়- পাঠ্য পুস্তক রচনা ও প্রচার করার উদ্দেশ্য নিয়ে। পরে দেখা যাবে যে এই স্কুল বুক সোসাইটিই বেথুন সাহেবের মাধ্যমে শম্ভুনাথকে অনুরোধ করছেন "পিয়ার্সনের বাক্যাবলী" নামক অভিধানকে পরিবর্ধন এবং পরিমার্জন করার জন্য - যা শম্ভুনাথ সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন।

প্রতিষ্ঠার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই স্কুল বুক সোসাইটি অনুভব করল যে দেশীয় পাঠশালা স্কুলের ঠিকমতো সংস্কার না হলে স্কুল বুক সোসাইটির আসল উদ্দেশ্য সফল হবে না। ফলস্বরূপ জে. এইচ. হ্যামিংটনের সভাপতিত্বে আটজন ভারতীয়

(মৌলভি মীর্জা কাসেম আলি খাঁ, মৌলভি ওয়ালেয়াল হোসেন, মৌলভি দরবেশ আলি, মৌলভি নুরুন্নবী; রসময় দত্ত, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেব ও উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) এবং ষোলজন ইউরোপীয়, মোট চব্বিশ জন কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য নিয়ে ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে ১লা সেপ্টেম্বর গঠিত হয় স্কুল সোসাইটির। রাধাকান্ত দেব হলেন সোসাইটির ভারতীয় সেক্রেটারি আর ইউরোপীয় সেক্রেটারি হলেন ই. এস. মন্টেগু। ইউরোপীয় সদস্যদের মধ্যে ডেভিড হেয়ার, উইলিয়াম কেরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। সোসাইটির একজন মাহিনাভোগী পণ্ডিত নিযুক্ত হলেন - তিনিই পাঠশালাসমূহের পরিদর্শক। পাঠশালার গুরুমশায়দের পড়ানোর পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা, ছাত্র এবং শিক্ষকদের পাঠ্য বই এর বিষয়বস্তু বুঝিয়ে দেওয়া, ছাত্রদের ত্রৈমাসিক পরীক্ষা নেওয়া প্রভৃতি কাজ পণ্ডিত মশায়ের ওপর অর্পিত হল।

প্রথম অবস্থায় যে তালিকা প্রস্তুত হল তাতে দেখা গেল ১৬৬টি পাঠশালা বর্তমান। কাজের সুবিধার জন্য এদের চারটি ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগের জন্য একজন তত্ত্বাবধায়ক এবং তার অধীনে একজন সরকার নিযুক্ত করা হল। সরকাররা তাঁদের অধীনস্থ পাঠশালা ঘুরে ঘুরে তাদের অবস্থা তত্ত্বাবধায়কদের জানাবেন। তবে এই ১৬৬টি পাঠশালার মধ্যে ৬৫টি সোসাইটির প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা পেত।

এই সমস্ত ব্যবস্থাপনায় ডেভিড হেয়ার এবং রাধাকান্ত দেবের অবদান অনস্বীকার্য। এক বছরের মধ্যে পাঠশালার সংখ্যা বেড়ে ১৯৪ টিতে দাঁড়াল। ছাত্রসংখ্যা হল ৩৭৮৭ জন।

সে সময়ে হিন্দু কলেজই ছিল উচ্চশিক্ষার একমাত্র স্থান। ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর হিন্দু কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ ঠিক করল সোসাইটির ২০ জন ছাত্রকে প্রতি বছর হিন্দু কলেজে উচ্চ শিক্ষার জন্য সুযোগ দেবে।

১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে সোসাইটির উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য শুধু চারটি নতুন বিদ্যালয়ই (এর মধ্যে একটি হ'ল আরপুলি পাঠশালা - যার খরচ চালাতেন ডেভিড হেয়ার) স্থাপিত হলনা - শ্রীরামপুর মিশনের একটি এবং ব্যাপটিস্ট মিশনের আর একটি বিদ্যালয়কে অধিগ্রহণ করা হল।

সোসাইটির কাজের পরিধি বেড়ে যাওয়ায় (পাঠ্য পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ, দেশীয় পাঠশালাগুলোকে সাহায্য, হিন্দু কলেজে পাঠরত কিছু ছাত্রের ফি নিয়মিত দান, আদর্শ স্কুল চালানোর খরচ, নিজস্ব পরিচালনা সংক্রান্ত খরচ প্রভৃতি), সোসাইটিকে ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে আদর্শ স্কুলগুলো ছেড়ে দিতে হল - যার ফলে দুএকটি

কিছুদিন বাদে উঠে গেল। তিনটির ভার নিল চার্চ মিশনারি সোসাইটি এবং একটির (আরপুলি পাঠশালা) ভার নিলেন ডেভিড হেয়ার। তবে ডেভিড হেয়ারের এবং সোসাইটির উদ্যোগে ১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দে পটলডাঙ্গায় একটা নতুন ইংরাজী স্কুল খোলা হল। এই বছরেরই মে মাস থেকে সোসাইটির আবেদনে সাড়া দিয়ে আর্থিক অনটন লাঘব করার জন্য সরকার মাসিক ৫০০ টাকা সাহায্য দিতে আরম্ভ করে।

সোসাইটি যে সমস্ত নিয়ম শিক্ষা ব্যবস্থায় চালু করল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য - বছরের গোড়ায় একটা নির্দিষ্ট সময়ে ভর্তি হওয়া, প্রত্যেক পাঠশালায় চারটি করে শ্রেণী, উচ্চ শ্রেণীর ছাত্ররা প্রয়োজনে নিচু শ্রেণীর ছাত্রদের পড়াশোনায় সাহায্য করবে, ত্রৈমাসিক পরীক্ষা এবং সমস্ত পাঠশালার উচ্চ শ্রেণীর ভাল ভাল ছাত্রদের নিয়ে বার্ষিক পরীক্ষার ব্যবস্থা (যাদের মধ্যে থেকে হিন্দু কলেজে উচ্চ শিক্ষার জন্য কিছু ছাত্র পাঠানো হত)।

সোসাইটির ছাত্রদের প্রথম বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে। তখন মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩৭৮৭ জন। পরীক্ষা দেয় ২৫২ জন। এর পরে কিছু কিছু পাঠশালা বন্ধ হয়েছে। আবার কিছু নতুন খোলাও হয়েছে। এই ভাবে দেখা যায় যে ১৮২৭ খ্রিষ্টাব্দে পাঠশালার সংখ্যা কমে হয়েছে ১৪৮টি কিন্তু ছাত্রসংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৬১২৬ জন। আরপুলি পাঠশালা এবং পটলডাঙ্গা স্কুলই হয়ে উঠেছে সোসাইটির আদর্শ স্কুল। যার ফলে দেখা যায় ১৮২৭ খ্রিষ্টাব্দে বার্ষিক পরীক্ষায় মোট যে ২১০ জন ছাত্র পরীক্ষায় বসেছিল, তারমধ্যে ছিল দেশীয় পাঠশালাগুলো থেকে ১২০ জন পটলডাঙ্গা স্কুল থেকে ৩০ জন, আরপুলি পাঠশালা থেকে ৩০ জন এবং হিন্দু কলেজের পাঠশালা বিভাগ থেকে ৩০ জন।

খ্রীষ্টতত্ত্বের মহিমা প্রচারকে গুরুত্ব দিয়ে এদিকে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার কিছুদিন বাদে ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন এবং ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় বিশপ্‌স্ কলেজ স্থাপিত হয়।

এদিকে সরকারের উদ্যোগে দেশীয় ভাষায় পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষা দেবার জন্য ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারি বৌবাজারে একটা ভাড়া করা বাড়ীতে সংস্কৃত কলেজ খোলা হয়। এই কলেজের নিজস্ব বাড়ী করার জন্য গোলদিঘির উত্তর দিকে পাঁচ বিঘা সাত কাঠা জমি কেনা হয়। বাড়ির জন্য সরকার এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা মঞ্জুর করে।

হিন্দু কলেজেরও তখন আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। সরকার তখন হিন্দু

কলেজকে মাসে মাসে দুশো আশি টাকা করে সাহায্য দিতে রাজি হয়। ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দু কলেজও উঠে এল সংস্কৃত কলেজের কাছাকাছি বৌবাজারে একটা ভাড়া করা বাড়ীতে। হিন্দু কলেজের আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে সাব্যস্ত হল সংস্কৃত কলেজের জন্য যে বাড়ী তৈরি হবে সেই বাড়ীতেই হিন্দু কলেজ ও তার স্কুল বিভাগের জন্যও ব্যবস্থা রাখা হবে। হিন্দু কলেজ তখন সরকারি অনুদান পাওয়ায় এরকম ব্যবস্থা করা সহজ হয়েছিল। ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে ২৫ ফেব্রুয়ারি সংস্কৃত কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যে ১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দে ডেভিড হেয়ার হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ সভার প্রথম অ-হিন্দু সদস্য হিসাবে যোগদান করেন।

১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে ১লা মে সংস্কৃত কলেজ এবং হিন্দু কলেজ উঠে এল নবনির্মিত ভবনে।

ওরিয়েন্টাল সেমিনারি প্রতিষ্ঠিত হয় আরও কিছুদিন পরে ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দের ১লা মার্চ। তখন হিন্দু কলেজ কলকাতায় সুপ্রতিষ্ঠিত।

হিন্দু কলেজ থেকে শিবপ্রসাদের (শম্ভুনাথের পিতা) কলুটোলাস্থ্ বাসা নিকটে হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পিতা তাঁকে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে ভর্তি করেন। অবশ্য তখন ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির প্রধান শিক্ষক হার্মান জেফ্রয়ের সুযোগ্য পরিচালনায়, ধীরে ধীরে বিখ্যাত লেখক কাপ্তেন ডেভিড· লেস্টার রিচার্ডসনের অধ্যক্ষতায় হিন্দু কলেজের সত্যিকারের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছিল।

শম্ভুনাথের কথা বলতে গিয়ে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি সম্বন্ধে মন্মথনাথ ঘোষ লিখেছেন যে "হিন্দু কলেজের ইংরাজী শিক্ষিত ছাত্রগণ এই সময়ে মদ্যপান ও অখাদ্য ভোজনদ্বারা, এবং মিশনারিগণ দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ খৃষ্ট ধর্মানুরক্তি প্রদর্শন করে যেভাবে হিন্দু আচার ও ধর্ম পদদলিত করত, তাতে হিন্দু অভিভাবকগণ সন্তানদিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিতে ভীত হয়ে উঠেছিলেন। শোভাবাজারের ধর্মনিষ্ঠ রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব ও রাজা কালীকৃষ্ণ দেব, নড়াইলের জমিদার (রাম) রতন রায়, সিমুলিয়ার কাশীনাথ ঘোষ এবং নিমতলার দত্তবংশীয়গণ প্রভৃতির সহযোগিতায় গৌরমোহন আঢ্য ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে ১লা মার্চ দিবসে নিমতলা মাণিক বসু ঘাট স্ট্রীটের এক বাড়ীতে ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারি নামক প্রসিদ্ধ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করে উচ্চতম প্রতীচ্যশিক্ষার সাথে হিন্দু বালকগনের হৃদয়ে স্বধর্মানুরাগ উদ্দীপ্ত করবার প্রয়াস পান। বিদ্যালয়ে অক্ষয়কুমার দত্তের ন্যায় একনিষ্ঠ

সাহিত্যসেবক, হিন্দু পেট্রিয়ট ও বেঙ্গলীর প্রবর্তক ও প্রথম সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষের ন্যায় অকৃত্রিম দেশসেবক, কৃষ্ণদাস পালের ন্যায় রাজনীতি বিশারদ, কৈলাসচন্দ্র বসু ও শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় ইংরাজী ভাষার সুপণ্ডিত ও সুলেখক এবং হাইকোর্টের প্রথম দেশীয় বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিতের ন্যায় ব্যবস্থাশাস্ত্র বিশারদ শিক্ষালাভ করে হিন্দুসমাজের গৌরব বর্ধন করেছেন।

"যাতে ছাত্রগণ বিশুদ্ধভাবে ইংরাজী লিখতে ও পড়তে পারে সেদিকে গৌরমোহনের প্রখর দৃষ্টি ছিল। শৈশব হতে ইংরাজী শব্দের যথাযথ উচ্চারণ শিক্ষা দিবার জন্য এবং বিশুদ্ধ ভাবে আবৃত্তি শিক্ষার জন্য তিনি নিম্নতর শ্রেণী থেকেই দুঃস্থ অথচ কৃতবিদ্য ইউরোপীয় শিক্ষক দ্বারা ছাত্রগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। যে সময়ে শম্ভুনাথ সেমিনারিতে প্রবেশ করেন সেই সময়ে হার্মান জেফ্রয় নামক একজন ফরাসী পণ্ডিত এর প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ইনি অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এবং ইউরোপীয় অনেকগুলি ভাষায় এঁর প্রভূত ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনি প্রথমে ব্যারিস্টার হয়ে এদেশে আসেন কিন্তু অত্যধিক পানদোষের জন্য ব্যবসায়ে প্রতিপত্তিলাভ করতে পারেননি এবং অত্যন্ত দারিদ্র্যদশায় পতিত হন। গৌরমোহন মাত্র একশত টাকা বেতনে একে স্বীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন।

"শম্ভুনাথের সতীর্থগণের মধ্যে বেঙ্গলী সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষের জ্যেষ্ঠাগ্রজ ক্ষেত্রচন্দ্র এবং নিমতলার দত্তবংশোদ্ভব ভবানীচরণ দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর নিম্নশ্রেণীতে শ্রীনাথ ঘোষ এবং আরও নিম্নশ্রেণীতে গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও কৈলাসচন্দ্র বসু প্রভৃতি পড়তেন।

"হার্মান জেফ্রয় অত্যন্ত যত্নসহকারে ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতেন। তাঁর অন্যতম প্রিয় ছাত্র ক্ষেত্রচন্দ্র আত্মচরিতে লিখেছেন যে এক এক দিন তিনি প্রমত্ত অবস্থাতেও ইংরাজী গ্রন্থাদি থেকে সুন্দর সুন্দর অংশের এরূপ মনোহর আবৃত্তি করতেন যে তদ্দারা ছাত্রগণ যথেষ্ট উপকৃত হত।

"সেকালে বিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহ, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণদ্বারা গৃহীত হত। শিক্ষা-পরিষদের সভাপতি স্যর এডওয়ার্ড রায়ান, হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ও বিখ্যাত লেখক কাপ্তেন ডেভিড লেষ্টার রিচার্ডসন প্রভৃতি ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারির ছাত্রগণকে পরীক্ষা করতেন।"

স্কুলের কথা বলতে গেলে স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা গৌরমোহন আঢ্যের কথা না

বললে পরিপূর্ণতা আসে না। তাঁরই এক সুযোগ্য ছাত্র এবং শম্ভুনাথের সহপাঠী ক্ষেত্রচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—

Babu Gour Mohun Auddy was born on the 20th January 1805, memorable as the year in which Nelson won his last victory and died a hero's death. Gour Mohun always dreaded a journey by water, and curiously enough, the only journey that he ever undertook in his life, in quest of a European teacher for his Seminary, proved fatal. His boat was caught in a gale, while he was returnig from Serampore to Calcutta, and he was drowned in the Hooghly off Goosery on the 23rd February 1845. So perished, in the prime of life, one who, though he was of humble parentage, limited means and mediocre attainments, did more for the spread of English education amongst his fellow countrymen in Bengal than perhaps any other Indian who could be named. As a Pioneer of English education in Bengal, he is worthy of having his name assoicated with the ever-memorable names of David Hare and Alexander Duff.

Beside the instructions which I and my fellow pupils received during the usual school hours, Babu Gour Mohun, for our further advancement in the knowledge of English, established a reading club, which was held in the evening and in which we read many other books than those which formed the curriculum of our studies during the school hours. In short, Babu Gour Mohun was more than a father.....

After I and some of my fellow students had made sufficient progress in our studies, we used to hold a debating club every week, our Headmaster, Mr. Herman Geoffroy, acting as our President. As I was a very eloquent speaker and considered to have been endowed by nature with the gift of the gab, Mr. Geoffroy always complimented me upon my oratorical powers, calling me the Demosthenes of the club and calling another boy, the late Babu Shumbhoo Nath Pundit, who was somewhat older than I was in years, but my junior in the class, as Phocion, whose arguments were much stronger but whose power of eloquence were somewhat inferior to mine. That gentleman prognosticated

that both Shumbhoo Nath and myself were destined, after leaving school, to figure in the world. With reference to my class fellow, Shumbhoo Nath Pundit, the prediction was verified , as after leaving school, that young man, by dint of a hard study of Law, rose from a subordinate position as Munshi in the late Sudder Dewany Adalut, to be a Judge of the Culcutta High Court on a salary of Rs. 50,000 per annum, a position which he filled with great honour for a few years only, an untimely death having unfortunately put an end to his glorious career ;.......

উপরিউক্ত স্মৃতিচারণায় পরিষ্কার যে স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের প্রতি কতটা যত্নবান ছিলেন। শুধু স্কুলেই নয় বাড়ীতেও শম্ভুনাথের পড়াশুনার প্রতি নজর ছিল। ফার্সি এবং সংস্কৃত শিক্ষার জন্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। যাঁরা দৈনিক বাড়ীতে এসে পড়িয়ে যেতেন।

তরুণ বয়সে শম্ভুনাথ খুবই চিত্তাকর্ষক ছিলেন - পড়াশুনায় পাণ্ডিত্য অর্জন অপেক্ষা চারপাশের বাস্তব বিষয়েই তাঁর মনোযোগ বেশী আকৃষ্ট হত। তিনি ছিলেন চটপটে, কর্মশীল - অলসতা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। নিয়মিত অত্যধিক ধারাবাহিক শ্রম তাঁর সহ্য হত না। তাঁর মনোদর্পণে যাই একবার ধরা দিত তা খুব তাড়াতাড়িই মনের মনিকোঠায় জায়গা করে নিত। তাঁর ঘনিষ্ঠ হওয়ার প্রবণতা, খোশমেজাজী ভদ্র আচরণ, গ্রাম্য সরলতা, হৃদয়ের মহত্ব, মধুর ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার, সাহস ও তেজ, সরল প্রাণ, স্পষ্টভাষিতা, যে কোন সমাজে যে কোন অবস্থায় মানিয়ে নেবার অসাধারণ গুণ, যে কোন পরিস্থিতিতে এমন কি খোশমেজাজে থেকেও জীবনধারণে কুশলী ইত্যাদি গুণের সমন্বয়ের জন্যই যাঁরা তাঁকে চিনতেন তাঁদের সকলের কাছে শম্ভুনাথ ছিলেন অত্যন্ত প্রিয়জন।

তিনি ছাত্রাবস্থায় প্রবল উৎসাহে নিজেকে স্থিরলক্ষ্যে সাহিত্য পাঠে নিয়োজিত করেছিলেন। পাঠ্য বই এর যে কোন পরিচ্ছেদ - যা কুশলী ছাত্রগণ সাধারণভাবেই শিক্ষা করে, তাই তাঁর মাথায় এমনভাবে চিন্তাজালের সৃষ্টি করে, যে তার থেকেই নতুন নতুন চিন্তার জন্ম নেয় এবং নতুনতর অর্থ প্রকাশ পায়। অপরিচিত একটিও শব্দ / বাক্য যতক্ষণ না পর্য্যন্ত হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি সেটা দীর্ঘ সময় নিয়ে ক্লাসে আলোচনা করতেন, তাতে কখনও কখনও অন্য সুযোগ্য সহপাঠিবৃন্দ বিরক্ত হতেন, পরে দেখা যেত, আলোচিত সেই সমস্ত শব্দ/বাক্যের অর্থও যা আপাতদৃষ্টিতে ন্যায়সঙ্গত মনে হয়েছিল তা সত্যে অন্যরকম হচ্ছে- এই যে

শম্ভুনাথের পৌত্র ভাস্কর উপেন্দ্রনাথ পণ্ডিত কৃত শম্ভুনাথের বাঙালি স্ত্রী হরিদাসীর আবক্ষ মূর্তি। (রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিতের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

অন্তর্দৃষ্টি, পারিপার্শ্বিকতা ভুলে লেগে থাকার প্রবণতা বা সত্যকে তুলে আনা, এটা তাঁর সহজাত গুণ - যার চূড়ান্ত প্রতিফলন দেখা যায় পরবর্তী কালে তাঁর ব্যবহারিক জীবনে।

যে ভাল ফুটবল খেলে সে ইচ্ছা করলে ভাল গাইতেও পারে, এই আপ্তবাক্য মেনে নিয়ে বলা যায় শম্ভুনাথ তাঁর মাথাকে অংক বিষয়ে বিশেষ নিয়োজিত করেননি। তবে এই বিভাগে কাশ্মীরি পণ্ডিতগণের সাধারণ বৈশিষ্ট্য 'অংকে নিরুৎসাহ', তাঁর চরিত্রেও প্রতিফলিত হয়েছিল। সত্যি বলতে কি সেই সময়ে একজন আদর্শ ছাত্রকে যেযে সম্মানে ভূষিত করা যেত, তার সব গুণাবলীই শম্ভুনাথের মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

পনের বছর বয়সে তিনি নিজেকে একজন সত্যিকারের সুন্দর যুবকে পরিণত করেছিলেন। তাঁর সুন্দর চেহারা, উজ্জ্বল ফর্সা গাত্রবর্ণ, অপরের জন্য কিছু উপকার করার ইচ্ছায় আপ্লুত মিষ্টি মুখমণ্ডল, মনোরঞ্জক আচার ব্যবহার, আনন্দদায়ক এবং কৌতুকপূর্ণ ব্যবহার, সকলকেই তাঁর পক্ষে সহজেই নিয়ে আসতে সাহায্য করত। সত্যসত্যই শম্ভুনাথ একজন বন্ধুত্বপূর্ণ, কৌতুকপূর্ণ, আমোদপূর্ণ অথচ চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন। বিদ্যালয় জীবনে বহু ঘটনা আছে যার দ্বারা তাঁর হৃদয়ের মহত্ত্ব, ভালমানুষি, বন্ধুপ্রীতি, সততার পরিচয় পাওয়া যায় - যার দুয়েকটি নিচে আলোচিত হল ঃ-

'বেঙ্গলী' (সম্পাদক গিরীশ চন্দ্র ঘোষ) কাগজ অনুযায়ী

১. At school, a drunken European with a naked sword once burst upon the boys whilst they were playing in the compound at tiffin hour, a tremendous sensation was created, masters, and students ran in every direction for their lives, Shambhu Nath's coolness and self possession prevented a catastrophe. He boldly confronted the drunken man, engaged him in conversation and dexterously disarmed him.

২. অন্য একটি একটি ঘটনা ছিল এরকম যে, একজন ভীষণদর্শন ফকির একটি ছাত্রকে অবমাননা করায় শম্ভুনাথ একদল ছাত্রকে একত্র করে অপরাধীকে বিদ্যালয়সংলগ্ন মাঠে এনে তার অপরাধের সমুচিত শাস্তি বিধান করেন।

শম্ভুনাথ তাঁর প্রত্যেক সতীর্থ ছাত্রের সাথেই বন্ধুত্বে আবদ্ধ হয়েছিলেন - যা আজীবন অটুট ছিল। তিনি যখন জীবনের পরঅধ্যায়ে সমাজের একজন কৃতবিদ্য পুরুষ, তখন তিনি কাউকেই ভোলেন নি। তিনি প্রায়ই বন্ধুগণকে নিমন্ত্রিত করে প্রচুর পরিমাণে আহার করাতে ভালবাসতেন। শৈশবের বন্ধুগণ যে অবস্থাতেই তাঁরা থাকুন

না, শম্ভুনাথের অকৃত্রিম প্রীতিলাভে কখনও বঞ্চিত হন নি। তিনি প্রতি বছর নিয়ম করে সকল বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে আহার করাতেন। তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু গিরিশচন্দ্র একস্থানে লিখেছেন যে, তাঁর সহপাঠিগণকে কিরূপে অন্বেষণ করে এনে একত্রে সম্মিলিত করতেন তা ভাবলে সময়ে সময়ে সন্দেহ হত তিনি বুঝি স্কুলের পুরাতন হাজিরা খাতাটা চুরি করে এনে তাঁর কাছে রেখে দিয়েছেন।

উপরিউক্ত মন্তব্যে তাঁর চরিত্রের বন্ধুপ্রীতি ছাড়াও অন্য একটি দিকও উন্মোচিত হয়, তিনি কি পরিমাণ শৃংখলাপরায়ণ ও সুসংহত ছিলেন- যা উত্তরকালে তাঁর নিজস্ব পেশায় কৃতকার্য হওয়াতে নিঃসন্দেহে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করেছে। মনে হয় তাঁকে যেন ভেতরের কোন এক ঐশীশক্তি সবসময় তাড়িত করে নিয়ে বেড়িয়েছে।

এ ভাবে তাঁর সমস্ত ছাত্রজীবন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে ওরিয়েন্টাল সেমিনারির প্রধান শিক্ষক সহ কিছু ব্যক্তি সেই সময়ই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তিনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি হবেন। যাঁরা তাঁর চরিত্রকে সম্যক উপলব্ধি করেছেন তাঁরা একটুও দ্বিধা করবেন না উচ্চারণ করতে যে শম্ভুনাথের মহত্ত্ব এবং নিজস্ব সহজাত ঔৎকর্ষই তাঁর চরিত্রের বিশেষ গুণ।

অস্বাভাবিক পরিস্থিতির ফলে শম্ভুনাথকে জীবনধারণের জন্য সচেষ্ট হতে হয় এবং বাধ্য হয়ে স্কুলের পড়াশুনায় ইতি টেনে ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি ছাড়তে হয় - তখন তিনি দশম শ্রেণীর ছাত্র। তাঁর স্কুল জীবন সম্বন্ধে Herman Geffroy ৯-৮-১৮৪২ তারিখে নিম্নরূপ একটি শংসা পত্র দেন।

"Shambhu Nath Pandit was a pupil of the first class in the Oriental Seminary and was examined by Sir Edward Ryan, Captain Richardson and other competent individuals and found to possess considerable knowledge of the English language and literature, can also vouch that he is considered as a respectable persian scholar. His conduct and character have uniformly elecited the approbation of his superiors."

ওরিয়েণ্টাল সেমীনারীর প্রতিষ্ঠাতা বাবু গৌরমোহন আঢ্য যাঁর নাম দেশীয় শিক্ষাপ্রসারে আগ্রহী প্রতিটি মানুষের স্মৃতিকোঠায় উজ্জ্বল, শম্ভুনাথের চরিত্রাঙ্কন করেছেন এভাবে,

'I can speak of his character in the best terms as far as it came under my own personal observation."

গার্হস্থ্য / ব্যবহারিক জীবন

শম্ভুনাথের জীবনী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় চল্লিশের দশক (১৮৪০-১৮৫০) তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই সময় বাবার আদেশে তাঁকে সংসার জীবন আরম্ভ করতে হয়। তাঁর প্রথম বিয়ে লক্ষ্মৌ নিবাসী মালো রানীর সাথে ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর ২০ বছর বয়সে, তখনও তিনি স্কুলের পড়া শেষ করে উঠতে পারেননি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে তিনি লক্ষ্মৌ থেকে ১৪ বছর বয়সে কলকাতায় ফিরে এসে একটু বেশী বয়সেই স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। এই বিয়েতে তিনি তখন মোটেই রাজি ছিলেন না, বরং লেখাপড়া করার ও জ্ঞান অন্বেষণের প্রতি ছিল তাঁর তীব্র আকর্ষণ। যদিও তাঁর বাবা খুবই উচ্চমানের লোক ছিলেন, তবুও তিনি ছিলেন খুবই জেদী এবং একগুঁয়ে ও নিজ সিদ্ধান্তে অনড় থাকতেন, অনেক চেষ্টাতেও তাঁকে টলানো যায়নি। তাঁর মতে যা শিক্ষালাভ হয়েছে তা জীবন নির্বাহের পক্ষে যথেষ্ট। হয়তো অনেকেই বাবার এই আদেশ মেনে নেওয়াকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারবেনা - কিন্তু ব্যতিক্রমী শম্ভুনাথ বাবার আদেশকে সম্মান দিয়ে সংসার জীবনে প্রবেশ করলেন। এরপরেও তিনি কিছুদিন চেষ্টা করেছিলেন পড়াশুনা চালিয়ে যাবার, কিন্তু শ্বশুর বাড়ী লক্ষ্মৌ নগরীতে ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দে মালতী জন্মাবার পর বাবার রোজগারে নিজের পরিবার চালানো - এটা প্রখর আত্মজ্ঞানসম্পন্ন শম্ভুনাথের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। এ ব্যাপারে বাবার দিক থেকেও চাপ ছিল। ফলস্বরূপ স্কুলের পড়ায় যতি টেনে চাকরির খোঁজে বের হন এবং কয়েকদিনের অক্লান্ত চেষ্টায় ফার্সী, উর্দু এবং ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি থাকায় সদর দেওয়ানি আদালতেই সহকারী মোহাফেজ হিসাবে ১৬ টাকা মাস মাইনেয় যোগদান করেন। শম্ভুনাথ অনিচ্ছায় বিয়ে করলেও স্ত্রীকে খুবই ভালবাসতেন - স্ত্রীকে সুখে রাখবার জন্য রোজগার বাড়ানোয় বিশেষ সচেষ্ট হলেন- অফিসের কাজের পর কোর্টের আইন সম্পর্কিত কাগজপত্র উকিল বা তাদের মক্কেলদের হয়ে ভাষান্তরিত করে তিনি তাঁর রোজগার বাড়িয়ে ছিলেন। ভাষান্তরিত করার কাজেও তিনি খুবই মনোযোগী ছিলেন। আইন ঘটিত কাগজ ভাষান্তরিত করার ফলে আইন সম্পর্কীয় ধারণা তখন থেকেই তাঁর মনে তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু মন্দভাগ্য তখন শম্ভুনাথকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। কলকাতায় তখন কলেরা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব হত এবং কখনও কখনও মহামারী আকার ধারণ করত। ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দের বর্ষার শেষ ভাগে কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর ছোটভাই অম্বরনাথের

মৃত্যু হয় - এর কয়েকদিন পরে একই রোগে তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। তাঁর পিতা খুবই খরুচে লোক ছিলেন। তিনি বিশেষ কিছু সঞ্চয় রেখে যেতে পারেননি। অল্প সময়ের মধ্যে প্রথমে ভাই এবং পরে বাবার মৃত্যু শম্ভুনাথকে খুবই মূহ্যমান করে তোলে। বাবা মারা যাবার পর আর্থিক অনটনের জন্য কলকাতার কলুটোলার বাসা বদল করতে হয়। বিভিন্ন কারণে তিনি ভবানীপুরে বাসা ভাড়া করেন। প্রথমতঃ কলুটোলার তুলনায় মফস্বল ভবানীপুরের বাসা ভাড়া কম, দ্বিতীয়ত কর্মস্থান সদর দেওয়ানি আদালত নিকটবর্তী হওয়ার জন্য যাতায়াতের খরচে সাশ্রয় এবং তৃতীয়ত ভবানীপুরে ঐ সময় আইন ব্যবসায়ে জড়িত উকিল বা মোক্তারদের বসতি ধীরে ধীরে বাড়ছিল - ফলত অফিসে কাজের পর আইন সম্পর্কীয় কাগজপত্র ভাষান্তরিত করে কিছু বেশি রোজগার করার সুযোগ ছিল - যা শম্ভুনাথ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করেছিলেন। বাবা মারা যাবার পর অর্থ রোজগার বাড়াবার আরও দুএকটা সুযোগ শম্ভুনাথ পেয়েছিলেন। বাবা মারা যাবার খবর শুনে একজন ভদ্রলোক, বাবার জীবদ্দশায় যিনি বাবার শত্রু ছিলেন তিনিই শম্ভুনাথকে ডেকে সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং উৎসাহিত করেছেন। কিছু মাসিক রোজগারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন কিছু কাজের বিনিময়ে। সেই ভদ্রলোক ছিলেন শম্ভুনাথের কাছে ভগবান প্রেরিত দেবদূতের মতো। তিনি ছিলেন একজন সদর কোর্টের মুসলমান উকিল।

এই সময় আর একটি সুযোগও তিনি পেয়েছিলেন, ভবানীপুর অঞ্চলের একজন জমিদারের বাড়ীতে তাঁর মেয়েকে ইংরাজী শিক্ষা দিয়ে কিছু রোজগারের। ইনি শম্ভুনাথকে খুবই স্নেহ করতেন। দেখা যায় যে শম্ভুনাথ যখনই কারও সংস্পর্শে এসেছেন তাকে যেন চুম্বকের মতো আকর্ষণ করেছেন। বাইরের সৌন্দর্য ছাড়াও (ফর্সা রং, যথাযথ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি, তীক্ষ্ণ অথচ ভাবালু চোখ, কাটাকাটা নাক, কোমল অথচ পেলব চেহারা) যেন ভেতরে কোন জাদুকাঠি তাঁর মধ্যে ছিল যার ফলে সকলেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হত। উক্ত জমিদার মহাশয়ও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। অসময়ে তিনি নানাভাবে তাঁকে সাহায্য করেছেন।

এই সময়, ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দের গোড়ার দিকে শ্বশুরালয় লক্ষ্ণৌতে শম্ভুনাথের স্ত্রী -বিয়োগ হয়। শম্ভুনাথ তখন খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন। একদিকে তিন বছরের মাতৃহারা আদরের মেয়ে ও অন্যদিকে অল্প সময়ের মধ্যে বাবা, ভাই, স্ত্রীর মৃত্যু শম্ভুনাথকে দিশেহারা করে দিয়েছিল। জীবন এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। খুব কাছ থেকে তাঁকে দেখেছেন এমন একজন সেই সময়ের বর্ণনা করেছেন এইভাবে যে

সারাজীবনে মাত্র এই একটা সময়েই শম্ভুনাথ নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন, এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল তাঁর ব্যক্তিগত জীবন - বহু কষ্টার্জিত অর্থ বাজেভাবে ব্যয় হয়ে যাচ্ছিল। ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও অনেক বুঝিয়েছেন। ফল বিশেষ হয়নি। সেই সময় বাংলা দেশের বিভিন্ন দিকে পট পরিবর্তন ছিল লক্ষণীয়। একদিকে ইংরেজ আগমনের ফলে বাঙালী সমাজের লোক যেমন প্রভূত অর্থ উপার্জন করে বিলাস ব্যসনে অকাতরে ব্যয় করছেন আবার অন্যদিকে কিছু বাঙালী নব্য তরুণ সম্প্রদায় আধুনিক শিক্ষা সংস্কৃতির ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালী সমাজে আনতে চাইছেন পরিবর্তন। বিনয় ঘোষ তাঁর 'বিদ্যাসাগর ও সমাজ' বইতে ইংরেজদের আধিপত্য যখন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সেই সম্বন্ধে বলছেন, "এক নবাবী আমল শেষ হলো। আর এক নবাবী আমল আরম্ভ হলো, ইংরেজদের নবাবী আমল। গোটা অষ্টাদশ শতাব্দীকেই প্রায় তাই বলা চলে ইংরেজ নবাব এবং তাদের প্রসাদতুষ্ট বাঙ্গালী দেওয়ান ও বেনিয়াদের স্বর্ণযুগ।"

এই সময়ে ভারতবর্ষে দাস ব্যবসা পুরোপুরি বজায় ছিল যা বেআইনী ঘোষিত হয়েছিল ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দে। সতীদাহ প্রথা, বহুবিবাহ প্রথা ও বিভিন্ন রকমের কুসংস্কারে সমাজ আবদ্ধ ছিল। সাধারণ শিক্ষিত সমাজে তখন মদ্যপান এবং বেশ্যালয়ে গমন খুবই স্বাভাবিক ছিল। পদস্খলণ হওয়ার সম্ভাবনা তখন ছিল প্রবল। এইরকম একটা সময়ে শম্ভুনাথকে সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্য দরকার ছিল সহৃদয় অনুভূতি সম্পন্ন কারও সান্নিধ্য ও ঐকান্তিক চেষ্টা। সেই সময় তিনি যে বাড়ীতে পড়াতেন তার এক মেয়ের কাছে তিনি শান্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। তারই প্রচেষ্টায় তিনি নিজেকে ফিরে পেতে লাগলেন। হরিদাসী নাম্নী সেই সহৃদয়া মহিলা শম্ভুনাথকে তাঁর কাজে উৎসাহিত করেছেন, পরে ওকালতি পড়ার জন্য মদত জুগিয়েছেন এবং সত্যিকারের বন্ধুর মতো আগলে রেখেছেন। এই হরিদাসীকে শম্ভুনাথ ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন। এই বিজাতিতে বিবাহ তাঁকে তাঁর নিজের সমাজ থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছিল। গোঁড়া ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও পারিবারিক প্রবল বাধা অগ্রাহ্য করে বিবেকের ডাকে সাড়া দিয়ে শম্ভুনাথ হরিদাসীকে বিয়ে করেছিলেন ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে, যা শম্ভুনাথের মতো চরিত্রের পক্ষেই সম্ভব। জানা যায় শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীটস্থ (তখনকার পিপল পাতি রোড) বসতবাড়ীটি (পরে যা পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়েছে) বিয়ের যৌতুক হিসেবে পাওয়া। বিয়ের পরে হরিদাসীরই অনুরোধে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয়, প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যা মালতীকে লক্ষ্মৌতে তার মামার বাড়ী থেকে নিয়ে এসে নিজের কাছে রেখেছিলেন।

একদল মানুষ থাকেন যাঁরা সর্বদাই সুখী, আর্থিক অনটন, সাংসারিক কূটকচালি, বা যে কোনরকমের অস্বাভাবিকতা তাদের সুখে সাধারণত বাদ সাধতে পারেনা। স্ত্রীলোক এরকম হলে, তাদের চরিত্রের মাধুরী দিয়ে যে কোন পুরুষকে উজ্জীবিত করতে পারে, যা এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। হরিদাসী ছিলেন এমনই এক গোত্রের। জীবনের সমস্ত ঝড় ঝাপটা তিনি যেন নিঃশেষে শুষে নিতেন। বলা যায়, এহেন হরিদাসীকে বন্ধু, সহচরী এবং পরে সহধর্মিণীরূপে পেয়েই যেন শম্ভুনাথ নিজেকে পূর্ণ বিকশিত করতে পেরেছিলেন।

ভবানীপুরে বাসা বদলি হওয়ার ফলে তাঁর আরও উপকার হয়েছিল-বিখ্যাত দেশহিতৈষী হরিশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং সদর আদালতের ধর্মভীরু, প্রসিদ্ধ আইনজীবী অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণের সাথে ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হতে পেরেছিলেন এবং তাঁদের বন্ধুত্ব ছিল অকৃত্রিম যা আমৃত্যু বজায় ছিল।

ভাষান্তর করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করার ফলে তাঁর পয়সা এবং জ্ঞান অর্জন ছাড়াও আর একটি উপকার সাধিত হয়েছিল। তাঁর ইংরাজী অনুবাদগুলো ইউরোপীয়দের খুবই প্রশংসা লাভ করেছিল।

এই সময়ে মিঃ ম্যাকলিয়ট তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন যে তিনি একজন বুদ্ধিমান এবং পরিষ্কার মাথার পার্সিয়ান এবং বাংলা দলিলের ভাষান্তরকারী। মি. ফ্রেঞ্চও সদর আদালতে তাঁর কাজ নিরীক্ষণ করে তাঁর পার্সিয়ান, হিন্দী, বাংলা এবং ইংরাজী ভাষার অগাধ জ্ঞান উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর জ্ঞান, প্রতিভা এবং ব্যবহার অচিরেই স্যার রবার্ট বার্লোর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ফলতঃ কিছুদিন বাদেই ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে তার অধীনে ডিক্রীজারী মুহুরীর পদপ্রাপ্ত হন। এই পদোন্নতিতে তিনি নিশ্চিত আনন্দিত হয়েছিলেন কিন্তু হয়তো ভাবতেও পারেননি, এখন যে পদের সামনে সামান্য একজন করণিক হিসাবে কাজ করছেন, ভবিষ্যৎ জীবনে একদিন সেই পদে নিজেই বিচরণ করবেন। ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দ তাঁর কাছে আরও অর্থবহ —এই সময়েই (১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দ) তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী হরিদাসীর গর্ভে তাঁর প্রথম পুত্রসন্তান রাধাগোবিন্দের জন্ম হয়।

এরপর আরম্ভ হল তাঁর কঠোর অধ্যবসায়। দিনে নিজের চাকুরীর কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করে অধিক রাত্রি পর্যন্ত পড়াশুনার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। অন্য সকলের থেকে যে গুণ তাঁকে বিশিষ্টতা দিয়েছে - তা হল তাঁর পার্শ্বিকতার পর্যবেক্ষণ এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে প্রয়োজনীয়টুকু আত্মস্থ করা।

প্রকৃতির শিক্ষা যেন তাঁর ওপর ভর করেছিল। "কোন মানুষই ভাল বক্তা হতে পারে না যদি না এই পৃথিবীরূপ শিক্ষালয়ে সর্বাবস্থায় মানুষের প্রকৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সে অনুভব করে"—এই আপ্তবাক্য তিনি কখনও ভুলে থেকেছেন বলে বোধ হয়না।

যখন তিনি ডিক্রীজারীর মুহুরী হিসাবে কাজ করছেন তখন তিনি পর্যবেক্ষণ এবং পড়াশুনাতেও সমান ব্যস্ত। তাঁর অনুভূতি থেকে বেরিয়ে এল ছোট একটি পুস্তিকা। "On Being of God"। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোথাও থেকে এর একটি সংখ্যা পাওয়া যায় নি। সমসাময়িক ব্যক্তির রচনা থেকে জানা যায়,

The perusal of this work furnishes the surest means of becoming fully acquainted with the bent and peculiar susceptibility of his mind to religious truths. In the illustration of Divine truth, he was at once perspicuous and faithful and his earnestness for the advancement of the honour of the Author of his being and the immortal interests of mankind gave an elevation and tenderness to his mind and diction. In public or private, in words or deeds or in the unpretending graces of an upright and honourable life, he afforded a striking example of one who is under a habitual sense of divine goodness.

তাঁর সতীর্থ ভবানীচরণ দত্তের সহযোগিতায় শম্ভুনাথ তাঁর ২৬ বছর বয়সে ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশ করেন "Notes on Bacon's Essays"। তাঁর প্রয়াস কতটা ফলপ্রসূ হয়েছিল তা সমসাময়িক প্রকাশিত দুএকটা চিঠির মাধ্যমে পরিষ্কার হয়। হিন্দু কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ মেজর রিচার্ডসন তাঁকে লিখেছিলেন—

"Many thanks for your explanations of Bacon. They do you great credit. I very well recollect how excellent an examination you passed at the Town Hall."

অন্য একখানি চিঠিতে একজন প্রথিতযশা ইংরাজ অধ্যাপক লিখেছিলেন—

"I thank you from my heart for your most acceptable present. From the hasty glance I have been able to give to it, it appears to be a creditable and praise-worthy undertaking. Even if it were utterly unworthy of approbation, great praise is due to you for having employed your leisure hours, so profitably to yourselves and particularly gratifying to your

teachers. May you both (Shambhu Nath and Babu Bhowani Prasad Datta) go on and prosper.

I never forget my pupils and I feel particularly pleased to hear from them."

সেই সময়ে Bacon's Essay র ওপরে এই টীকা সুধী সমাজে খুব আদরণীয় হয়েছিল। এই টীকা প্রকাশের পরে The Patriot পত্রিকা প্রকাশ করছে যে গ্রন্থকারদ্বয় বাঙ্গলায় যথাক্রমে "বোমন্থ" ও "ফ্লেচার" নামে অভিহিত হতেন।

তৎকালীন সমাজে যখন অধিকাংশ যুবক আমোদ আহ্লাদে মেতে থাকত তখন শম্ভুনাথকে সদরকোর্টের নির্ধারিত কাজ ছাড়াও, আয় বাড়ানোর জন্য job work করতে হত। এতদসত্ত্বেও উপরিউক্ত জাতীয় বই রচনা করার প্রয়াসে, তাঁর পরিশ্রম করার মানসিকতা, সাহিত্যপ্রীতি এবং পড়াশুনার প্রতি তীব্র আকর্ষণ প্রতিফলিত হয়।

এর অব্যবহিত পরে সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ের ওপর শম্ভুনাথ একটি যুগান্তকারী পুস্তিকা রচনা করেন, The Law Relating to the Execution of Decrees. এই প্রসঙ্গে অমরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা Centinel of Liberty নামব পুস্তকে যা বর্ণিত হয়েছে তা খুবই প্রাসঙ্গিক, যা নিচে দেওয়া হল—

"What are you doing ?" asked the Record Keeper of the Sudder Dewany Adalat at Calcutta to his assistant who was engaged in writing something.

"I am writing a book on the execution of decrees"– replied the young man.

"What do you say ? You are writing a book without your duties in office. I am reporting against you to the Judge." He did report.

The young man was called.

"Why were you neglecting your official duty ?"-enquired the hoary headed Judge with a stern face.

"I finished my duties and was writing a small treatise on execution of decrees"-replied the young man fearlessiy.

"Show me what you have written."

The young assistant brought the manuscript and showed it to the Judge.

The Judge was astonished to read a few pages. He could not believe his eyes.

"Is it your own composition ?" - the Judge asked.

"Yes Sir, during my leisure period I have studied the procedure of execution and the defects in it."

The Judge found it was a brilliant work which could pass as one by an experienced and able lawyer.

" You are destined to be a great lawyer. I am sorry that the Record keeper rebuked you."

The Judge's assessment was correct.

অনুসন্ধিৎসা জাগানোর মতো এই পুস্তিকা। এই পুস্তিকা প্রকাশের মধ্য দিয়েই যেন পাওয়া যায় তাঁর ভবিষ্যতের স্পষ্ট আভাস। তিনি তখন ডিক্রীজারী মুহুরীর পদে আসীন। বাল্যকালে স্কুলে পাঠ করার সময় যা পরিলক্ষিত হয়েছিল, প্রতিটি বাক্য / শব্দ হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে তার ভেতরের ভাব বার করে নিয়ে আসার যে প্রবণতা, তা তাঁর কর্মেও প্রতিফলিত হচ্ছিল। লেখাপড়ার প্রতি তীব্র অনুরাগ এবং সমস্ত কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করার ক্ষমতা এবং মহৎ সঙ্কল্প নিয়ে কিছু করার ইচ্ছাই তাঁকে এই পুস্তিকা রচনার কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং তা সদর দেওয়ানি আদালতের জজদের, সরকারের এবং বিশেষভাবে তাঁর পৃষ্ঠপোষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাঁর পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে পিতৃপ্রতিম স্যার রবার্ট বার্লো অন্যতম। তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্যপ্রতিম অধীনস্থ কর্মচারীর কৃতিত্বে বিশেষ গর্বিত হন। তাঁর পুস্তিকাকে ঘিরে চারপাশের এই ঐকান্তিক আগ্রহ শম্ভুনাথকে আত্মতুষ্টি তো দিলইনা বরং তাঁকে যেন আরও উজ্জীবিত করে তুলল। অত্যধিক শ্রম এবং কৃচ্ছ্রসাধনে শম্ভুনাথের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটল। তাঁর ফুসফুস আক্রান্ত হল। তিনি চিকিৎসার সাথে সাথে অবিরাম কাজও চালিয়ে যেতে লাগলেন। ঠিক এই সময় সদর দেওয়ানি আদালতে রিডার এর পদ খালি হয় এবং শম্ভুনাথ এইপদের জন্য প্রার্থী হন। কিন্তু পিতৃসম স্যার রবার্ট বার্লো তাঁর প্রিয় শিষ্যের দাবি নাকচ করে দেন। তাঁর মতে রিডার এর মতো শ্রমশীল পদ গ্রহণ করলে শম্ভুনাথের স্বাস্থ্যের আরও অবনতি হবে।

এতে কর্তব্যে সদাসর্বদা অটল শম্ভুনাথ খুবই নিরাশ হন এবং তাঁর বন্ধু ২৪ পরগণার তৎকালীন প্রধান সদর আমীন হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বন্ধুকে আইন অধ্যয়ন করে সদর আদালতে ওকালতি করার পরামর্শ

দেন। জেদি শম্ভুনাথ মনস্থির করে ফেলেন। সাময়িক নিরাশা ঝেড়ে ফেলে নতুন উদ্যমে ওকালতি পড়ার সঙ্কল্প করলেন। তখনকার দিনে আইন পড়বার স্বীকৃত কোন সংস্থা ছিল না এবং বিজ্ঞানভিত্তিক আইন পড়ার কোন নির্দেশনামাও ছিলনা। ফলত ওকালতি পাশ করতে গেলে ছাত্রদের খুব অসুবিধায় পড়তে হত।

দশম শ্রেনী পর্যন্ত যাঁর তথাকথিত স্কুলের শিক্ষা, তিনি আইন পড়বার সংকল্প করলেন। ভাবতেও শিহরন জাগে। মনে হয় বর্তমান প্রেক্ষাপটে আইন ব্যবসার উৎপত্তি ও বর্তমান বিচার ব্যবস্থার ক্রমবিবর্তন আলোচিত হলে শম্ভুনাথের চরিত্র সম্যকভাবে জানা যাবে—যা নীচে সংক্ষেপে আলোচিত হল।

বর্তমান বিচার ব্যবস্থার ক্রম বিবর্তন

বিদেশে নিজেদের কাজ কারবার সম্পর্কীয় আইনি জটিলতার সমাধানের জন্য বিভিন্ন সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি Letters Patent বলে আইন প্রণয়ন করেছে।

লন্ডন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর রানী এলিজাবেথের প্রথম সনদ প্রাপ্ত হয়। ১৬১৯ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের রাজা জেমস-১ কোম্পানিকে তার ইংরেজ কর্মচারী এবং ইচ্ছুক দেশীয় মানুষের ওপর কিছু আইন প্রণয়ন এবং প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষমতা অর্পণ করে রাজকীয় সনদ দান করেন। ১৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে রাজা চার্লস - ২ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গভর্নর এবং তার কাউন্সিলকে রাজকীয় সনদ প্রদান করেন এই মর্মে যে, "hold General courts, make bye-laws and to judge all persons belonging to the said Governor and company or that should live under them, in all cases, whether civil or criminal - according to the Laws of the kingdom and to execute Justice accordingly."(Bran - Annals of the East India Company, 1,p. 557)

উপরোক্ত সনদ থাকা সত্ত্বেও ১৬৬৮ খ্রিষ্টাব্দে মুম্বাইতে প্রথম বিচারালয় প্রতিষ্ঠার আগে কোম্পানির কোন বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এরপর ৯. ৮. ১৬৮৩ তারিখের Letters Patent অনুযায়ী ১৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দে বোম্বাইতে অ্যাডমিরালটি বিচারালয় স্থাপিত হয়। এর মধ্যে অবশ্য ১৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে মাদ্রাজে উপরিউক্ত মতে বিচারালয় স্থাপিত হয়। কলকাতায় বিচারালয় স্থাপিত হয় আরও পরে।

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ১৬০০ টাকার বিনিময়ে কলিকাতা, গোবিন্দপুর ও সুতানটি এই তিনটি গ্রামের জমিদারী স্বত্বের বাংলার নবাবের কাছ থেকে সম্মতি পায়। কিন্তু দিল্লীর বাদশাহের ফরমান মেলে ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে। যার

ফলে সেই সময় থেকে কোম্পানি জমিদার হিসাবে মর্যাদা পায় এবং দেশীয় জমিদারের মতো কাছারিতে রাজস্ব আদায় এবং প্রজাদের সমস্ত রকম অন্যায়ের বিচার করতে থাকে। কলকাতায় প্রথম নিয়মিত আদালত স্থাপিত হয় ১৭২৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ শে সেপ্টেম্বরে রাজকীয় সনদ বলে - আদালতের নাম হয় Mayor's Court। কলকাতার সাথে বোম্বাই ও মাদ্রাজেও একই সঙ্গে Mayor's Court স্থাপিত হয়। কলকাতার Mayor's Court এর কাজ আরম্ভ হয় ১৭২৭ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরে। মেয়র আদালত স্থাপিত হলেও জমিদারের কাছারিতে অবস্থিত কোম্পানির আদালতের বিচার ব্যবস্থাও দেশীয় নিয়মানুযায়ী পাশাপাশি চলতে থাকে। মেয়র আদালতের বিচার ইংল্যান্ডের প্রচলিত আইন বিধি অনুযায়ী হত। ইংরাজী ভাষাতেই কাজকর্ম হত। Mayor's Court প্রথমে লালবাজার এবং মিশন রোডের মাঝে Ambassador's office - এ, তারপর তা স্থানান্তরিত হয় এক মিশনারীর কেনা বাড়ীতে যেখানে আজ বিনয় বাদল দীনেশ বাগের উত্তর পূর্ব কোণে অবস্থিত St. Andrew's Church অবস্থান করছে। অবশ্যই পুরানো বাড়ীটি এখন অন্তর্হিত। ওই বাড়ীটি Old Court House নামেই পরিচিত ছিল। ওই নাম অনুসারেই সামনের রাস্তার নাম রাখা হয় Old Court House Street.

ইতিমধ্যে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থারও পরিবর্তন হয়। ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব মারা যান। মোঘল সাম্রাজ্যের দ্রুত পতন শুরু হয়। ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ এবং ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দের বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজদের জয়, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলার প্রভু বানিয়ে দেয়। ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দের ১২ ই আগষ্ট ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে। দেওয়ানি লাভের পর থেকে ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজস্ব আদায় এবং দেওয়ানি বিচার পর্যন্ত পরিচালনা করতেন মুর্শিদাবাদ নিবাসী বাংলার নায়েব নবাব মহম্মদ রেজা খান এবং পাটনা নিবাসী বিহারের নায়েব সীতাব রায়। এঁরা বাংলার নায়েবের অধীন ছিলেন। ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার গর্ভনর হয়ে আসেন। তিনি এসেই নায়েব নবাবদের ক্ষমতাচ্যুত করে মফস্বলের রাজস্ব আদায় এবং দেওয়ানি ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা সম্পূর্নরূপে কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে আনেন। বিচারালয়ের ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ করা হয় এবং সর্বোচ্চস্তরে রাখা হয় সদর কোর্টকে। সদর দেওয়ানি আদালতকে করা হয় দেওয়ানি এবং সদর নিজামত আদালতকে করা হয় ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার উচ্চতম আদালত। গর্ভনর এবং বেঙ্গল কাউন্সিল এর সভ্যরা সদর

দেওয়ানি আদালতের জজ এবং বাংলার নবাব নাজিম বা তার প্রতিভূ হন নিজামত আদালতের সর্বোচ্চ ব্যক্তি।

ইতিমধ্যে সরকারী রাজকোষ মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। ওয়ারেন হেস্টিংস সদর নিজামত আদালতকে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করেন ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে এবং তা ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পুনরায় মুর্শিদাবাদে ফিরে আসে যা ১৭৯০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদেই বহাল ছিল। ১৭৯০ খ্রিষ্টাব্দে পুনরায় লর্ড কর্নওয়ালিস একে কলকাতায় তুলে নিয়ে আসেন এবং তা হাইকোর্ট কর্তৃক ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে অধিগ্রহণ করা পর্যন্ত কলকাতাতেই অবস্থিত ছিল।

সদর দেওয়ানি আদালত ১৮ ই মার্চ ১৭৭৩ তারিখে খোলা হয় মফস্বল আদালতের আপিল শোনার জন্য। ১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে খোলা হলেও ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে সাময়িক বন্ধ থাকে এবং ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দে পুনরায় শুরু হয়।

১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানি অত্যন্ত আর্থিক অস্বচ্ছলতার মধ্যে পড়ে এবং ব্রিটিশ সরকারের কাছে ঋণের জন্য আবেদন করে। ফলস্বরূপ কোম্পানির কার্যকলাপের ওপর সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং মেয়র কোর্টের অব্যবস্থা দূর করার জন্য British Parliament প্রথমে পদক্ষেপ গ্রহণ করে Regulating Act 1773 প্রণয়নের মাধ্যমে। Bengal Council পুনর্গঠিত হয়, মেয়র কোর্টের বিলোপ সাধন হয় এবং Supreme Court of Judicature প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতায় ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এবং নির্দেশিত হয় এর জজেদের নিযুক্ত করবেন ইংল্যান্ডের রাজা। এর কার্যক্ষেত্র প্রেসিডেন্সি টাউন এর সীমানার মধ্যে সমস্থ ফৌজদারি এবং দেওয়ানি উভয় ক্ষেত্রেই, ব্রিটিশ সংক্রান্ত বিষয়ে (প্রেসিডেন্সি টাউনে বা এর বাইরেও), ভারতীয় ব্রিটিশ কর্মচারী এবং কোম্পানির সমস্ত কার্যকলাপের ওপর প্রযোজ্য হবে। স্যার ইলাইজা ইম্পে সুপ্রীম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে এঁর প্রদত্ত দন্ডাদেশ বলেই ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ৫ই আগষ্ট শনিবার সকাল ৯ টায় মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি হয়।

কিন্তু এবার বিরোধ দেখা দিল Supreme Court এবং East India Co's Court (সদর দেওয়ানি আদালত) এর মধ্যে যারা আলাদা আলাদা স্বাধীন ভাবে একই সময়ে কাজ করছিল। ফলত Parliament কে হস্তক্ষেপ করতে হয়।

ফলস্বরূপ ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে Act of Settlement পাশ করতে হয়। যাতে Supreme Court এর কাজ করার এলাকা ঠিক করে দেওয়া হয়। এর ফলে পরের

৮০ বছর বিচারের কাজ মসৃণভাবে চলেছিল। ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দের Act of Settlement এ সময়ে সময়ে কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়।

১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে পাশ হয় Queen's Court (সুপ্রীম কোর্ট) এবং কোম্পানির Chief Court (সদর আদালত) কে মিলিয়ে দিয়ে High Courts Act (24 and 25 Vict. c.-4 of 6.8.1861) যাতে High Court এর এলাকা এবং ক্ষমতা Letters Patent অনুযায়ী হবে বলে ঠিক হয়। ১৪.৫.১৮৬২ তারিখের Letters Patent অনুসারে কলকাতা High Court ১.৭.১৮৬২ তারিখ হতে কাজ আরম্ভ করে।

১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট বর্ত্তমান The High Court of Judicature at Fort William in Bengal এর সৃষ্টি হল। তখনকার সুপ্রীম কোর্ট এবং সদর দেওয়ানী আদালত ও সদর নিজামত আদালত এক হয়ে গেল। Victoria Chapter 104, 28 & 2V Starbesic অনুসারে এই মিলন সংঘটিত হল। সেই সময় আর একটি নিয়ম প্রবর্তিত হল। সদর দেওয়ানি আদালতের সমস্ত উকিলরাই হাইকোর্টের উকিল বলে পরিগণিত হলেন এবং সকলেই ব্যবসা করবার অনুমতি পেলেন, সুপ্রিম কোর্টের এবং সদর দেওয়ানি আদালতের জজগণকেই হাইকোর্টের জজ করা হল।

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার বার্ণেস পিকক্ কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হলেন। প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার বার্ণেস পিকক্ ব্যতীত নিম্নলিখিত বিচারপতিগণ কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম বিচারকমণ্ডলী —

(১) মাননীয় মিঃ চার্লস রবার্ট জ্যাকসন—ব্যারিস্টার।

(২) মাননীয় মিঃ মর্ড্যান্ট লাউসন ওয়েলস—ব্যারিস্টার।

(৩) মাননীয় মিঃ চার্লস্ বিনি ট্রেভর — সিভিল সার্ভিস।

(৪) মাননীয় মিঃ হেনরী টমাস রাইক্স— সিভিল সার্ভিস।

(৫) মাননীয় মিঃ জর্জ লক — সিভিল সার্ভিস।

(৬) মাননীয় মিঃ ভিনসেন্ট বেইলী — সিভিল সার্ভিস।

(৭) মাননীয় মিঃ চালর্স স্টিয়ার— সিভিল সার্ভিস।

(৮) মাননীয় মিঃ জন প্যাক্সটন নরম্যান— ব্যারিস্টার।

(ইনি ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর কলকাতা টাউন হলে আবদুল্লা নামক জনৈক ওয়াহবীর ছুরিকাঘাতে নিহত হন।)

(৯) মাননীয় মিঃ ওয়াল্টার মর্গ্যান— ব্যারিস্টার।

(১০) মাননীয় মিঃ ফ্রান্সিস বারিংকেম্প— ব্যারিস্টার।

(১১) মাননীয় মিঃ ওয়াল্টার স্টক সেটনকার— সিভিল সার্ভিস।

(১২) মাননীয় মিঃ স্টুয়ার্ট জ্যাকসন— সিভিল সার্ভিস।

(১৩) মাননীয় মিঃ এডোয়ার্ড ডিলাটুর— সিভিল সার্ভিস।

১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বরের Letters patent-এ কলকাতা হাইকোর্টের ক্ষমতা ও এলাকা পুণরায় নূতন করে নির্দিষ্ট হল।

১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ভারত শাসন সংস্কার আইনে কলকাতা হাইকোর্টের এক বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। কলকাতা হাইকোর্টের যে সকল বিষয় ভারত সরকারের অধীন ছিল সে সকল বিষয় প্রাদেশিক সরকারের অধীন হল।

এই আইনে প্রদেশিক স্বায়ত্বশাসনের অধিকার স্বীকৃত হলেও কলকাতা হাইকোর্টের ব্যয়-বরাদ্দের ব্যাপার প্রাদেশিক আইন সভার ভোট নিরপেক্ষ করা হল। বর্তমানেও হাইকোর্টের ব্যয়-বরাদ্দের ব্যাপার রাজ্য বিধান সভার ভোট নিরপেক্ষ।

এর পর ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী নূতন সংবিধান প্রবর্তিত হল। "The High Court of Judicature at Fort William in Bengal" - এর পরিবর্তে এর নাম হল "High Court at Calcutta" কলকাতা হাইকোর্টের এলাকা এক সময়ে বহু বিস্তৃত ছিল। দেশ বিভাগ ও বিভিন্ন রাজ্যে নতুন নতুন হাইকোর্ট স্থাপিত হওয়ার ফলে কলকাতা হাইকোর্টের এলাকা ক্ষুদ্রতর হয়ে পড়ল।

ইং ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্টে জজেদের (Puisni Judge) বেতন নির্ধারিত হয় বাৎসরিক ৫০০০০ টাকা। (Vide Calcutta Gazelle 1862 p2533)। তখন ইংরাজ জজ অথবা দেশীয় জজদের বেতনের কোন পার্থক্য ছিল না।

তখনকার দিনে সদর কোর্টের মোক্তারদের কাছেই মক্কেলরা সর্বপ্রথম আসত এবং তারাই নিজেদের মনোমত প্রয়োজন অনুযায়ী উকিল নিযুক্ত করতো। তখন মোক্তারদের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। ওকালতি পেশায় যাঁরা নতুন তাঁরা সাধারণত মোক্তারদের মুখাপেক্ষী হয়েই থাকত।

তখনকার দিনে আইনের ওপর বই খুব কম ছিল। তাই দেখা যায় শম্ভুনাথ যখন হিন্দু কলেজের আইন অধ্যাপক তখন তিনি আইন বিষয়ক বহু লেখা নিজব্যয়ে

ছাপিয়ে ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করছেন - তাঁর ছাত্রদের (পরে কৃতবিদ্য) জীবনী থেকে জানা যায় যে কলেজের বেতনের (মাসিক ৪০০ টাকা) সমস্ত টাকা তো বটেই উপরন্তু তাঁর নিজস্ব ওকালতি ব্যবসায়ের আয়ের কিছু এই কাজ সম্পাদন করার জন্য ব্যয়িত হত। যা হোক ঐ সময়ের বই বিক্রেতাদের বিজ্ঞাপন থেকে ঐ সময়ের প্রচলিত আইন পুস্তকের এবং এর মূল্যের একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে এরকম একটি বিজ্ঞাপন সন্নিবেশিত হ'ল।

Law Books (1840-50)

1.	The Regulation 8vols(1793-1828) Molony's arrangement-	100/-
	Colebrooke's Digest of Hindu Law-3-vols	25/-
	Halhead's Gentoo Law	4/-
	Macnaghten's Reports (1791-1829)-4 vols	40/-
	Morton's Decision of Supreme Court-	8/-

Indian Law Books-1845

2.	Regulation-of the East India Company Complete set, second hand	200/-
	Dale's Alphabetical Index of Regulation-(Second Hand)	20/-
	Colebrooke's Treaties on Obligation & Contracts	4/-
	Peter's Circular Orders of the Suddar Board-	50/-
	Constructions of the Sadar Dewani Adalats and Nizamat Adalat Regulations	25/-
	Cheap, G.C., The Circular Orders of Nizamat Adalat 1796-1844-	16/-

Source : Friend of India-27th February, 1845.

রামচন্দ্র শর্মা ভৌমিকের সম্পাদনায় (১৮৬০) আদালত গাইডে সেই সময়ে প্রচলিত পুস্তকের কিছু হদিস পাওয়া যায়, যা নিচে দেওয়া হল—

১৮৫৫ উইলসন হোরেস হেমান/এ গ্লসারি অফ জুডিসিয়াল এণ্ড রেভিনিউ টার্মস (ইংরাজী)

লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার দায় দত্তক রত্নাকর ১৮৬৫
জন রবিনসন / ডিকশনারি অফ ল এণ্ড আদার টার্মস ১৮৬০ (ইংরাজী)
রামচন্দ্র শর্মা ভৌমিক / ব্যবস্থাসার
ভারতচন্দ্র শিরোমণি / দত্তক শিরোমণি
মেকনাটন, আর, ওহে, / হিন্দু ও মহমদীয় ব্যবস্থা (ইংরাজী)
জীমূতবাহন / দায়ভাগ, ১৮৬৫ ব্রজমোহন তর্কালঙ্কার (অনু)
দায় রত্নাবলী /মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার দ্বারা সংস্কৃত হইতে অনু ১ নং ১৮২৫
রামজয় তর্কালঙ্কার / দায় জৈমুদী এবং দত্ত কৌমুদি এবং ব্যবস্থা সংগ্রহ ১৮২৭
হরিহর ঘোষাল / পত্রকৌমুদী ১৮৫৪ পাট্টা কবুলিওত দরখাস্ত এবং ওকালতনামা ও আরজী তমসুক নালিসাদি।
পত্রকৌমুদী / ওয়াল্টর সীটনকার ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র সং ১৮৩৩, ২ খণ্ড
পাট্টা কবুলিয়ৎ প্রভৃতি স্বত্ব সম্মন্ধীয় লেখন, ৪ খণ্ড
বিচারালয়ের প্রচলিত লেখনের আদর্শ

আইন ব্যবসার উৎপত্তি

রাজত্ব/রাষ্ট্র যত ছোটই হোক, রাজা/সম্রাট বা নির্বাচিত শাসনকর্তা যদি পরিচালনা/শাসনের সাথে সাথে আইন এবং বিচার ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু, যুক্তিযুক্ত এবং নিরপেক্ষ রূপ না দিতে পারে তবে রাজত্ব টিকে গেলেও শাসনকর্তার আয়ুষ্কাল ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য।

প্রণীত আইন এবং বিচারব্যবস্থার মাঝামাঝি যোগসূত্র হিসেবে রুজিরোজগারের জন্য যাদের অবস্থান তাদের বলা যেতে পারে আইন ব্যবসায়ে যুক্ত।

স্মরণাতীত কাল থেকেই হিন্দুদিগের মধ্যে ব্যবহারজীবী প্রথা প্রচলিত ছিল। নারদ স্মৃতিতে এর উল্লেখ আছে। শিরোমণি রঘুনন্দনের "ব্যবহার তত্ত্বে" দেখা যায় বৃহস্পতি, কাত্যায়ন, ব্যাস প্রভৃতি ঋষিরা এর ব্যবস্থা করেছেন। শুক্রনীতিতেও ব্যবহারজীবীর উল্লেখ আছে।

খ্রিষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে, ঠিক পূর্ব শতাব্দীতে বৌদ্ধ রাজত্বকালেও ব্যবহারজীবীর ব্যবস্থা ছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থ 'মিলিন্দ পঞহো (মিলিন্দ প্রশ্ন) ধর্মতাত' গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে যে ব্যবহারজীবীরা আইনের ব্যবসা করত। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিন্দুরাজত্বের সময়েও বিচারালয় ছিল। বিচারালয়ে ব্যবহারজীবীদের ব্যবসার প্রচলন
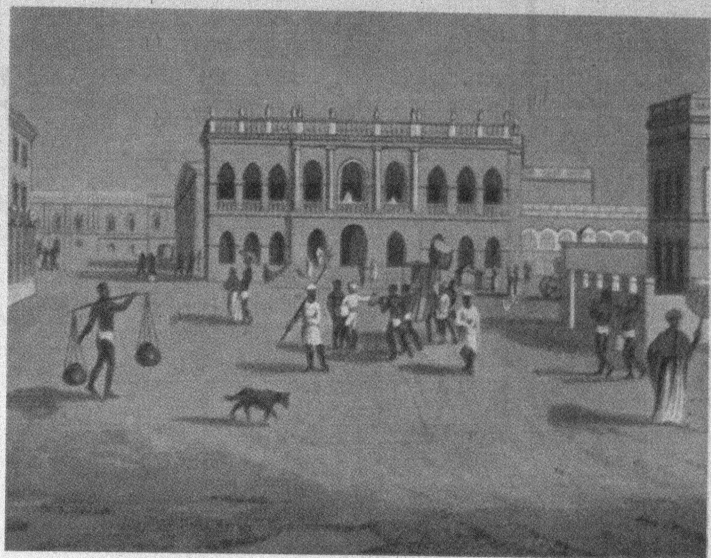
ওল্ড কোর্ট হাউস যার একাংশ মেয়রস কোর্ট (১৭২৬-১৭৭৩)
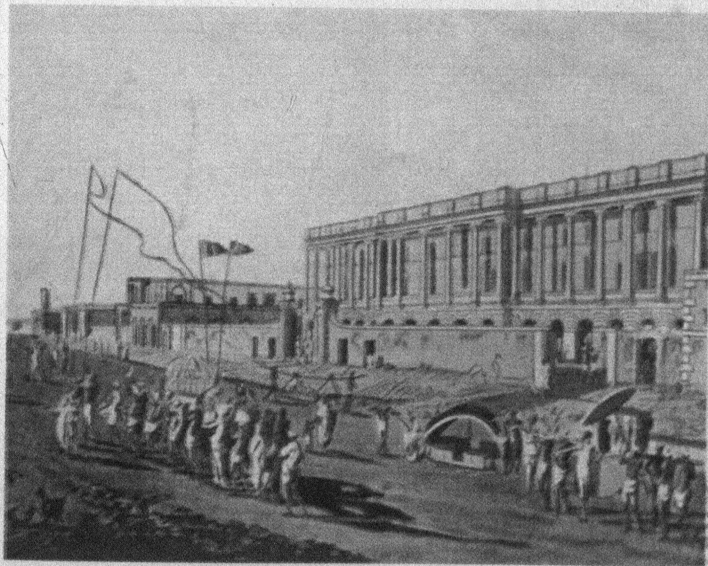
সুপ্রিম কোর্ট ফোর্ট উইলিয়ামে (১৭৭৪-১৮৬১)
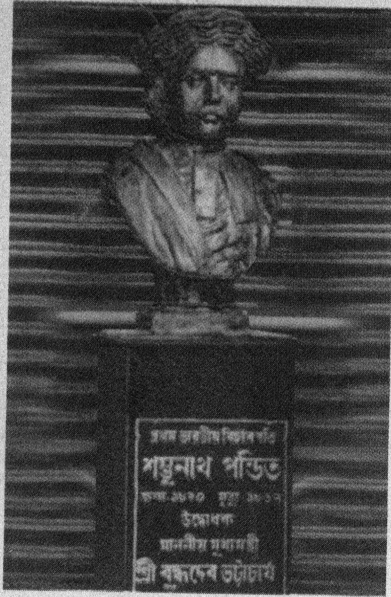
শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্মৃতিরক্ষা কমিটি কর্তৃক শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালের প্রবেশপথে স্থাপিত ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কর্তৃক উন্মোচিত শম্ভুনাথের আবক্ষ ব্রোঞ্জ মূর্তি। মূর্তিটি তৈরি করেছেন ভাস্কর বিমান দাস।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্মৃতিরক্ষা কমিটি কর্তৃক হাইকোর্টে স্থাপিত ও হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি শ্রী অশোককুমার মাথুর কর্তৃক উন্মোচিত শম্ভুনাথের আবক্ষ ব্রোঞ্জ মূর্তি। মূর্তিটি রূপ নিয়েছে ভাস্কর বিমান দাসের হাতে।
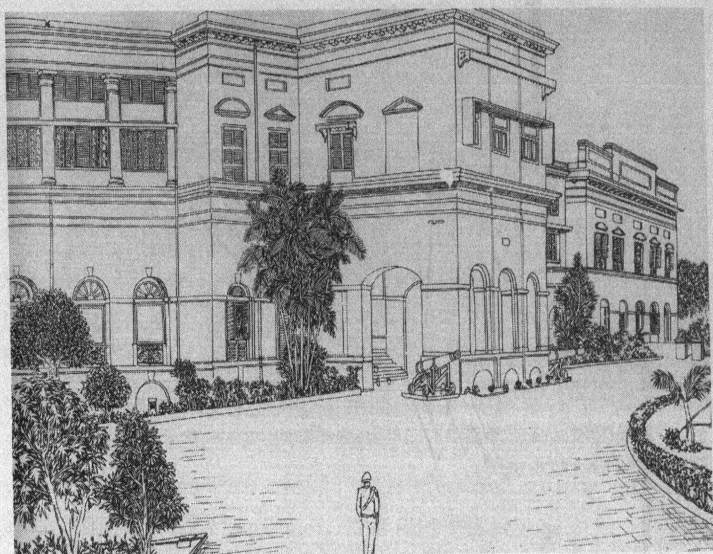
সদর দেওয়ানি আদালত।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিটের শম্ভুনাথ পণ্ডিতের বসতবাটির সামনে থেকে নেওয়া বর্তমান চিত্র। বহিরঙ্গে প্রায় অপরিবর্তিত।

১৮৬৫ সালে কলকাতা হাইকোর্টের অন্যান্য বিচারপতিদের সঙ্গে শম্ভুনাথ পণ্ডিত (দাঁড়িয়ে ডানদিক থেকে চতুর্থ)।
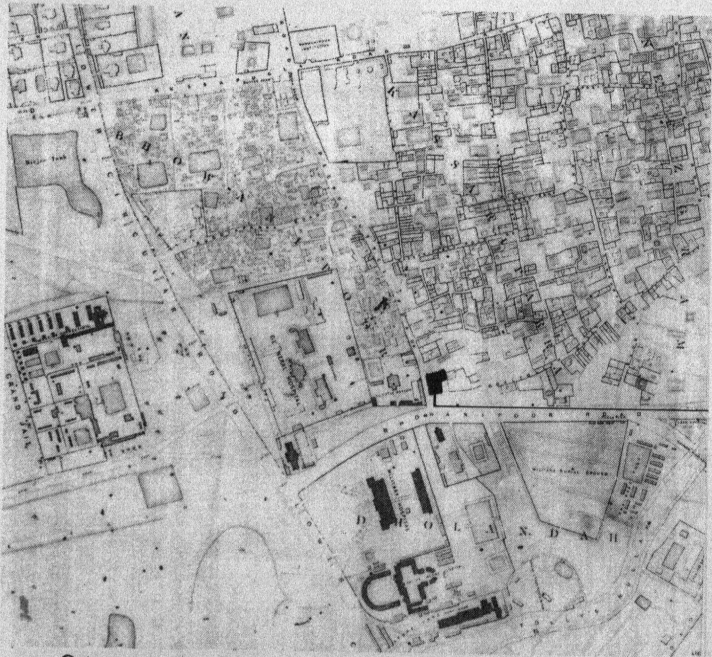
১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে ক্যাপ্টেন প্রিন্সেপ কর্তৃক অঙ্কিত কলকাতার মানচিত্রে শম্ভুনাথের বসতবাটির অবস্থান। রামরাম তরফদারের বসতবাটি, পিপলপাতি রোড। (জাতীয় গ্রন্থাগার-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত)

ছিল। অষ্টম শতাব্দীতে মুসলমান জাতির মধ্যে ইসলাম আইনের প্রচলন ছিল।

রাজা বা শাসনকর্ত্তা বিচারক নিযুক্ত করতেন, সেই বিচারক সমীপে বাদী ও প্রতিবাদী ব্যক্তিগণ স্ব স্ব বক্তব্য ও অভিযোগ পেশ করত, কিন্তু বক্তব্য বা অভিযোগ, বাদ প্রতিবাদ প্রভৃতি বিসম্বাদের সমস্ত ব্যাপার সম্যকরূপ বোঝান অনেক সময়ে সকল অভিযোগকারীর বা অভিযুক্তর সাধ্যে কুলোত না। বাদী প্রতিবাদী সাক্ষী প্রভৃতিকে প্রশ্নকৌশলে ঘটনার সত্য নির্ঘন্ট করা এবং বিচারককে বাক্য-বিন্যাসে বিশ্বাস করাতে প্রত্যেক ব্যক্তি সক্ষম হত না। এতদ্ব্যতীত বিধিবদ্ধ রাজবিধান ও শাস্ত্র বিধি বা দলিলাদি কাগজপত্র বুঝিয়ে দেওয়া, নিরক্ষর বা সামান্য বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিগণের দ্বারা সম্পন্ন হত না। ঐ সকল কারণে বাদী প্রতিবাদী তাদের স্ব স্ব মোকর্দমা বিচারক সমীপে পরিচালন করবার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি নিয়োগ করত। তারা বিচারপ্রার্থী ব্যক্তিগণের প্রতিনিধি স্বরূপ গৃহীত হত। মুসলমান রাজত্ব কালে ঐরূপ প্রতিনিধি, উকিল (Vakeel) বলে অভিহিত হতেন। তাঁরা মোকর্দমার পারিশ্রমিক স্বরূপ পক্ষগণের নিকট হতে মূল্য প্রাপ্ত হতেন। মোকদ্দমা পরিচালনকারী ব্যক্তিগণের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা ছিল না অথবা রাজা বা শাসনকর্তা বা বিচারক কেউই তাঁদের নিয়োগ করত না, তাঁরা সম্পূর্ণ পক্ষগণেরই পরিচারক, এই ভাবে এক প্রকার লোক তাদের জীবিকা অর্জন করত।

ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধ্যক্ষগণ দেখল যে ঐ সকল ব্যক্তিকে একটা নিয়মের মধ্যে রাখা দরকার, কারণ অনেক অনিষ্টজনক কাজ হয়, তদ্ব্যতীত হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্রে এবং রাজবিধি সম্বন্ধে তারা সে রকম অভিজ্ঞ নয়, সুতরাং কর্তৃপক্ষগণ নিজেরা বিবেচনা করে উকিল নিয়োগ করার ব্যবস্থা করলেন। সেই ব্যবস্থাটা একটা কোম্পানি কৃত আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ হল। (Regulation VII of 1793). তখন সদর দেওয়ানি আদালত ঐ সকল উকিল নিযুক্ত করত এবং তাদের একটা সনদ দিত। উকিলরাও প্রথম সনদ প্রাপ্তির সময়ে হলফ করে আদালত থেকে নির্ধারিত উকিলের কর্ত্তব্য কার্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হত। কলকাতার মুসলমান কলেজের ছাত্রগণ অথবা কাশীর হিন্দু কলেজের ছাত্রগণকেই ওকালতির অধিকার দেওয়া হত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সদর দেওয়ানী আদালতে মুসলমান উকিলদের সংখ্যা বেশী ছিল। তখনকার মামলা মকর্দমার কাগজ পত্র থেকে শেখ রহমতুল্লা, মুন্সী আমিনুদ্দিন আমেদ, শেখ শুক্রালা (শূকর উল্লা) মির রাজব আলী ঘেয়াউদ্দীন আমেদ, মীর আলী হাসান, শ্যামসুন্দর পণ্ডিত,

সদানন্দ পণ্ডিত, শিবশঙ্কর পণ্ডিত, প্রতাপনারায়ণ দত্ত, জগন্নাথ সিংহ, নীলমণি হালদার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

পরে উকিলদের পারিশ্রমিকও আইনের দ্বারা নির্ধারিত করবার ব্যবস্থা হয়। (Regulation VIII of 1796). তারপর (Regulation X of 1803) আইনের দ্বারা পূর্বোক্ত আইন দুটোর কিছু পরিবর্তন করা হয়। তারপরে Regulation XXVII of 1814 আইনের দ্বারা পূর্বোক্ত আইনগুলির কিছু কিছু সংস্কার হয়। সদর দেওয়ানি আদালত আর উকিল নিয়োগ করতো না। জেলার জজেরা এবং রাজধানীর বিচারালয় প্রদেশস্থ উচ্চ বিচারালয়ের অনুমতি নিয়ে স্ব স্ব আদালতে কাজ করবার জন্য উকিল নিযুক্ত করবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হলেন। তার ফলে জজদের ব্যক্তিগত বিবেচনা অনুসারে উকিল নিযুক্ত হত। বিচার সংক্রান্ত কাজকর্মে এবং প্রাদেশিক বা জেলা আদালতে উকিল হিসাবে নিয়োজিত হবার ইচ্ছুক প্রার্থীদের বাৎসরিক পরীক্ষা গ্রহণের জন্য ১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দের একটা কমিটি গঠন করা হল।

পূর্বে যে মুসলমান ও হিন্দু জাতি থেকে উকিল নিযুক্ত হত সে নিয়ম পরিবর্তিত হয়ে Regulation XII of 1833 আইনের বিধান মতে সমস্ত জাতির যে কোন ধর্মী নিযুক্ত হতে পারত।

সদর দেওয়ানি আদালত লাইসেন্স প্রাপ্ত উকিল ব্যতীত কোন কোন নির্দিষ্ট মকর্দমা পরিচালনার জন্য যে কোন ব্যক্তিকে অনুমতি দিতে পারত। সেই সকল ব্যক্তি পূর্বোক্ত উকিলদের মতোই ক্ষমতা প্রাপ্ত হত। এরপর ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দের Act 1 (S-4) অনুযায়ী ওকালতি করার জন্য বাধ্যতামূলক পেশাগত পরীক্ষা চালু হয়। দেওয়ানি আদালত এই ওকালতি পরীক্ষার আয়োজন করে। কৃতকার্য পরীক্ষার্থীগণকে সনদ প্রদান করার ব্যবস্থা হয় এবং এর ফলে উকিল হওয়ার যোগ্যতা অর্জিত হয়।

ক্রমশঃ উকিলদের পসার দেখে এবং আইন ব্যবসাটা লাভজনক কারবার দেখে অনেকেরই লালসা হল এবং মক্কেল সংগ্রহ, মকর্দমার তদ্বির করা প্রভৃতি কাজ করবার জন্য একদল অল্প শিক্ষিত কিন্তু বুদ্ধিমান গ্রাম্য পাটোয়ার গোছের লোক উকিলদের এক প্রকার দালাল রূপে আবির্ভূত হল। তারা ধড়িবাজ ও চতুর, সুতরাং তাঁদের সহায়ে উকিলরাও সহজে মক্কেল পেতে লাগল এবং তাদেরও নানা ফন্দি করে বেশ দুপয়সা রোজগার হতে লাগল, কিন্তু তারা ক্রমশঃ মক্কেলদের নিকট অন্যায় ভাবে টাকা আদায় করতে আরম্ভ করল। তখন বিচারকেরা তাদের দমন করবার জন্য পরীক্ষার ফাঁদে ফেলে মোক্তারি সনদ দিয়ে উকিলদেরই নিচে স্থান দিল

এবং উকিলদের মত কতকটা আইনের পেঁচ খেলা দেখাবার অধিকারও দিল। মক্কেলদেরও সুবিধা হল, তারা উকিল না দিয়ে কম মূল্যে, তাদের দ্বারাই মকর্দমা চালাতে লাগল। এতদ্ব্যতীত ঐ সময়ে আইন ব্যবসার বাজারে রেভিনিউ এজেন্ট নামক আর এক প্রকারের ব্যবহারজীবী তৈরী হল (Act xx of 1865)

উক্ত আইনে এরূপ নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছিল ঃ-

১. উচ্চশ্রেণীর উকিল।

২. নিম্নশ্রেণীর উকিল।

যারা বি, এ পাশ করে আইন কলেজে আইনের বক্তৃতা শুনে ২ বছর বাদে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করত, তারা বি, এল হত এবং যারা তখনকার এল, এ পাশ করে ঐরূপ ভাবে আইন পাশ করত, তারা এল. এল হত। এরা জজের আদালত ও তন্নিম্ন আদালতে ওকালতি করতে পারত। এরা উচ্চশ্রেণীর উকিল বা জজের উকিল।

আর নিম্নশ্রেণীর উকিলরা মুনসেফ আদালতে ও ছোট আদালতে (Small Causes Court এ) ওকালতি করতে পেত।

নিম্নশ্রেণীর উকিলরা এন্ট্রান্স পাশ করে আইন পরীক্ষা দিলেই উকিল হতে পারত। নিম্নশ্রেণীর উকিলদিগকে উচ্চশ্রেণীর উকিলদের অপেক্ষা কিছু কম নম্বর রাখতে পারলেই পাশ হত। মোক্তাররাও মুনসেফি আদালতে এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম নিয়ে ফৌজদারি আদালতেও আইন ব্যবসা করতে পারত। তবে মুনসেফি আদালতে তারা উকিলদের মত সওয়াল জবাব বা সাক্ষীর জেরা প্রভৃতি করতে পারত না, অন্যান্য কাজ উকিলদের মতই করতে পারত। ফৌজদারি আদালতে উকিলদের সাথে মোক্তারদের কোন তফাৎ থাকত না।

মাইনর অথবা উচ্চপ্রাইমারী পরীক্ষায় পাশ করলেই মোক্তারি পরীক্ষা দেওয়া যেত।

ক্রমশঃ যখন উকিল মোক্তারের সংখ্যা বাড়তে লাগল এবং পরীক্ষা নেওয়া, সনদ ইত্যাদি নানা কার্য্যে সুশৃঙ্খলতার জন্য বাংলা গভর্ণমেন্ট হাইকোর্টের মাননীয় জজ বাহাদুরদের সাথে পরামর্শ করে ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে এক মন্তব্য (resolution) জারি করলেন। তাতে একটি আইন পরীক্ষা সমিতি গঠিত হল। তার নামকরণ হল Board of Examiners। পরে ঐ নাম পরিবর্তন করে Committee for the Legal Education করা হয়।

কমিটি এরূপ ভাবে গঠিত হয় ঃ

১। মহামান্য হাইকোর্টের একজন জজকে অবৈতনিক সভাপতি হতে হবে।

২। একজন ব্যারিস্টারকে বেতনভোগী সম্পাদক করা হবে।

৩। উকিল কিংবা ব্যারিস্টারদের মধ্যে ৪ জনকে বেতনভোগী সভ্য করা হবে এবং তাঁরাই পরীক্ষক নিযুক্ত হবেন।

৪। ২ জন সিভিলিয়ানকে অবৈতনিক সভ্য করা হবে।

উক্ত ব্যবস্থামত সর্বপ্রথম নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কর্মচারী নিযুক্ত হন ঃ

Mr. Justice Markby, President.

Mr. C. Jackson, Bar-at-Law. Secretary.

Paid Members :-

Mr. Ingram, Bar-at-Law.

Mr.Millet, Bar-at-Law.

Babu Annada Prosad Banerjee, Pleader.

Babu Mohini Mohon Rai. Pleader.

Civilian Members

The Legal Remembrancer.

Registrar of the Appellate side, High Court.

এর পর ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে উক্ত আইনের কিছু পরিবর্তন হয়। (Rule No. 3 of 7th March, 1884) ।

উক্ত আইনে এন্ট্রান্স পাশ করে যাঁরা ওকালতি পরীক্ষা দিয়ে নিম্নশ্রেণীর উকিল হতে পারত তাদের অধিকার লুপ্ত হল এবং এন্ট্রান্স পাশ না করলে আর মোক্তারি পরীক্ষা দিতে পারবে না এরূপ ব্যবস্থা হল।

এরূপ ব্যবস্থা বহুদিন চলছিল কিন্তু বি. এল এর সংখ্যা জেলার আদালত সমূহে অতিরিক্ত হওয়ায় এবং এফ. এ পাশ করে তাদের সমকক্ষ উকিল হয়ে থাকবে এটা অনেকের বরদাস্ত না হওয়ার, ক্রমান্বয়ে আন্দোলন হতে লাগল যে ঐ প্রথা উঠিয়ে দেওয়া হোক। অনেকেই উঠিয়ে দেবার পক্ষপাতী ছিলেন না, তাঁরা বলতেন যে অনেকে অর্থাভাবে, বি. এল পরীক্ষা দিতে পারে না, অথচ এফ. এ পাশ করে সে যদি এরূপ একটা সম্মান জনক ব্যবসার অধিকার পায় তবে তাদের জীবিকা অর্জনের সুবিধা হয়, নতুবা এফ. এ পাশ করে তার আর কোন উপায় থাকে না।

যা হোক উক্ত পরীক্ষা উঠে গেল। কেবলমাত্র মোক্তারি পরীক্ষাটাই বজায় রইল। বি.এ, এফ. এ, এন্ট্রান্স সকলেই ঐ পরীক্ষা দেবার অধিকারী হল।

এখানে মনে রাখা দরকার যে শম্ভুনাথ স্কুলের পড়াও শেষ করতে পারেননি, নিজেকে কোন স্তরে নিয়ে গেলে এবং কিরকম প্রস্তুতি নিলে আইন পড়ার মতো সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব। তিনি প্রাণপাত করে পড়াশুনা আরম্ভ করলেন - আইন পরীক্ষায় বসার জন্য।

ধৈর্যসহকারে অধ্যয়ন করে যাওয়ার অভ্যাস যা প্রথম অবস্থায় যে কোন ছাত্রের কাছে ক্লান্তিকর, যা না গড়ে তুলতে পারলে ওকালতি সনদ পাওয়া খুবই মুস্কিল হয়ে দাঁড়ায়, তা শম্ভুনাথের প্রথম অবস্থা থেকেই করায়ত্ত ছিল। বলা যায় এই পেশা এবং শম্ভুনাথ যেন একাত্ম।

তখন ওকালতি পরীক্ষা দেবার পূর্বে চরিত্র সম্বন্ধে একটি সুপারিশ-পত্র দাখিল করতে হত। সদর কোর্টের রেজিষ্ট্রার কার্কপেট্রিক ১৯শে জুলাই ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে শম্ভুনাথকে নিম্নলিখিত শংসাপত্র দেন—

"এত দ্বারা বিজ্ঞপ্তি করা যাইতেছে যে ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দে সদর আদালতের অফিসে শম্ভুনাথ পণ্ডিতের নিয়োগাবধি আমি তাঁহার চরিত্র ও বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞানলাভের সুযোগ পাইয়াছি। তিনি ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়াছেন এবং প্রধান প্রাচ্য ভাষাগুলিতেও তাঁহার সমধিক অধিকার আছে। তাঁহার নীতিজ্ঞানও প্রশংসনীয় এবং ইংরাজী শিক্ষার অনুযায়ী এবং তাঁহার স্বভাব ও চরিত্র নির্দোষ, এই কারণে যাঁহারা জানেন সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন। তাঁহার সকল বিষয়েই বেশ জ্ঞান আছে - আইন প্রভৃতির জ্ঞান কিছু কম নহে।"

১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ১৬ই নভেম্বর শম্ভুনাথ সদর কোর্টে ওকালতির সনদ প্রাপ্ত হন। অতি শীঘ্রই শম্ভুনাথ ব্যবহারজীবীর ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ করেন। এর কারণ এই যে যখন তিনি অল্প বেতনে মুহুরীর কাজে নিযুক্ত ছিলেন তখন থেকেই সযত্নে ব্যবহারশাস্ত্র পাঠ করতে আরম্ভ করেছিলেন এবং নিজের বাড়ীতে স্বনামধন্য হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বন্ধুগণের সাথে জটিল মোকর্দমা-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আইনের কূট তর্কবিতর্ক দ্বারা স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধি মার্জিত করতেন। হরিশ্চন্দ্রের অভিন্নহৃদয় সুহৃদ গিরিশচন্দ্রের জীবনচরিত বিষয়ক এক গ্রন্থে এ সম্বন্ধে উল্লেখিত হয়েছে—

"সে সময় এক্ষণকার সুপ্রসিদ্ধ সহকারী উকিল শম্ভুনাথ পণ্ডিত সদর কোর্টের একজন মুহুরীমাত্র ছিলেন। তিনি ভবানীপুরে আসিয়া বাস করিতেছিলেন, তাঁহার

অন্ধকারময় ক্ষুদ্র কক্ষে তাঁহার সদগুণে মুগ্ধ একদল যুবক শীঘ্রই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। হরিশ উক্ত দলের নেতা ছিলেন। শম্ভুনাথ বা হরিশ কেহই অনর্থক গল্পগুজবে কালক্ষেপ করিতে ভালবাসিতেন না। উভয়েই কর্মপ্রিয় ছিলেন, এবং তাহার ফলে শীঘ্রই একটি আইনসভা প্রতিষ্ঠিত হইল। সেই ক্ষুদ্র ঘরটিতে আইন সম্বন্ধে যে বাদানুবাদ হইত তাহা অতি উচ্চদরের। কোন অপরিচিত ব্যক্তি সহসা সে গৃহে প্রবেশ করিলে তাহা ব্যবহারজীবীদিগের শিক্ষাস্থান বলিয়া ভ্রমে পতিত হইতেন। আইনের বিভিন্ন বিধি ব্যবস্থাদি পরস্পরের প্রতি নবশিক্ষার্থীর উৎসাহ এবং প্রধান ব্যবহারজীবীর নিপুণতার সহিত নিক্ষিপ্ত ও প্রতিনিক্ষিপ্ত হইতেছে। তর্ক-বিতর্কের স্রোত এরূপ বেগে প্রবাহিত হইতেছে যে অবিশেষজ্ঞের পক্ষে তাহার গতি নিরীক্ষণ করা দুঃসাধ্য, মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়া যায়। প্রথম আদালত যে রায় দিয়াছেন, আপীল আদালতে তাহা রহিত হইয়াছে, তাহার পর সদর আদালতে তাহার আলোচনা হইয়া পুনর্বিচারের আদেশ হইয়াছে। শম্ভুনাথের বাড়ীতে কাল্পনিক আদালত বসিয়াছে তাহাতে সমস্ত মোকদ্দমা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পুনরালোচিত হইল, উভয় পক্ষেই কৌন্সিলী নিযুক্ত হইয়া যেরূপ উৎসাহের সহিত বাক্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন তাহা প্রকৃত বিচারালয়ের যুদ্ধ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। যেসকল অভিমত প্রকাশিত হইল তাহা সারবত্তা ও মৌলিকতায় সদর আদালতের বিজ্ঞতম বিচারকের অভিমতের সমতুল্য। তাহার পর এক অত্যুগ্র বাদানুবাদ আরম্ভ হইল। অমুক আইনের অমুক বিশেষ বিধান ইহার প্রতিকূল। উক্ত বিশেষ বিধানের মূল বিশ্লেষিত হইল। উক্ত আইনের উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে উদঘাটিত হইল।"

এইভাবে প্রতিভাশালী বন্ধুগণের সাথে তর্ক-বিতর্ক দ্বারা শম্ভুনাথ তাঁর তর্কশক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বর্ধিত করে ভবিষ্যৎ উন্নতির সূত্রপাত করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় শম্ভুনাথ একজন সফল আইনজীবী হতে কিভাবে নিজেকে ধীরে ধীরে তৈরি করেছেন। ১৬.১১.১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে আইনের সনদ প্রাপ্তি পর্যন্ত নিজেকে তৈরি করার যে অমানুষিক শ্রম তিনি করেছেন তা একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভবই বলা যায়। তার আসল কর্মজীবন শুরু হয় এর পরের সময় থেকেই। এরপরে তাঁকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ইংরাজী ভাষায় কুশলী আইনজীবীর সংখ্যা তখন ছিল না বললেই চলে, তার উপর তাঁর ছিল ফার্সি এবং উর্দু ভাষায় দখল।

১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে যখন শম্ভুনাথ সদর দেওয়ানী আদালতে উকিল হিসাবে যোগদান করেন তখন নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নির্দিষ্ট বেতনে বিভিন্ন পদে আসীন ছিলেন ঃ

ডব্লু. কার্কপেট্রিক	ডেঃ রেজিস্টার	৬০০ টাকা
আনন্দ চন্দ্র বোস	ডেঃ রেজিস্টার	৫০০ টাকা
নীলমণি ব্যানার্জী	এ্যাসিস্টান্ট রেকর্ড কিপার	১০০ টাকা
মৌলভি আবদুল রহমান কাজী	ল অফিসার	৩০০ টাকা
বৈদ্যনাথ মিশ্র পণ্ডিত	ল অফিসার	২৫০ টাকা
প্রসন্ন কুমার টেগোড় (সিনিয়র)	গভঃ প্লিডার	২০০ টাকা
মুন্সি আমির আলি	স্পেশাল কোর্ট কমিশনার	১৫০ টাকা

প্লিডার কোর্ট ঃ

এ. এ. ইমল্যাক, এ. এ. সিভেষ্টার, ই. কোলব্রুক, জে. জি. ওয়ালার, জি. এস. জাজ, আর. ই. মেগার (সিনিয়র), আর. নোরিস, গোলাম সোফদার, আব্বাস আলি, নীলমণি ব্যানার্জী, রমাপ্রসাদ রায়, সি. গ্লাস।

ওকালতি পাশ করার আগেই তাঁর দ্বিতীয় পুত্র শঙ্করনাথের জন্ম হয়। ইনিও পরবর্তী জীবনে ওকালতি পাশ করেন, কলকাতা আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইংরাজী ভাষায় ৮ খানি এবং বাংলা ভাষায় ১৬ খানি পুস্তক রচনা করেন।

সমসাময়িক কালে ভারত সরকারের ব্যবস্থা সচিব ও শিক্ষা পরিষদের সভাপতি জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন স্বীয়পদে যোগ দিয়ে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য সচেষ্ট হন। শম্ভুনাথ এই ব্যাপারে খুবই আগ্রহী ছিলেন, ফলতঃ ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। শম্ভুনাথ ও বেথুনের ঘনিষ্টতা দিন দিনই বৃদ্ধি পায়। ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে বেথুন স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়। এতে প্রথম যে কুড়ি জন ছাত্রী ভর্তি হয়েছিল তার মধ্যে শম্ভুনাথের কন্যা মালতী অন্যতমা। মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারে এই চেষ্টা বহু দিক থেকেই নিন্দিত ও সমালোচিত হয়। যার ফলে ভর্তি হওয়ার অব্যবহিত পরেই সাতজন ছাত্রীর অভিভাবক তাঁদের মেয়েদের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যান। এ সম্পর্কে খবরের কাগজে (হিন্দু পেট্রিয়ট) প্রকাশিত জনৈক হরিশ চন্দ্র তর্কালংকারের লেখা একটা চিঠি এবং ঘটনাদির বিবরণ সন্নিবেশিত হল—

The Hindu Intelligencer June 18, 1849(Monday)

THE NATURE FEMALE SCHOOL.

To the editor of the Hindu Intelligencer, Sir, - will you kindly insert in a corner of your paper the undermentioned letter, which I

have taken the liberty to address to the parents and guardians, who have sent their daughters to the Victoria Baleeka Bidyaloy, and oblige the undersigned :-

TO THE PARENTS AND GUARDIANS, WHO HAVE SENT THEIR DAUGHTERS TO THE VICTORIA BALEEKA BIDYALAY.

GENTLEMEN- when I take into consideration the natural right, which providence has vested in parents and guardians, with regard to their children, I cannot for a moment deny the power you have to regulate the moral and physical improvement of your own children, but how distressing and heart - rending it is to behold that this right, either from want of discretion or from motives quite corrupt, should be perverted by the parents and guardians for purpose to serve their own interest. Circumstances have lately transpired, which justify our including you in this category, and I trust, you will consider me your sincere well-wisher, for exposing to your views the awful sacrilege, which you have been led to commit towards your Maker, by the ill advices of some of your friends. I could induce you to offer your repentance and desist from countenancing a measure, which, if you will calmly reflect, is contrary to the will of God, and consequently to the laws of the country. You see, Gentleman, that the birds of the jungle, and the beasts of the forest, are all from the nature of their birth attritional creatures, and have no conscience to repent, nor the dread of punishment in after life, yet how wonderful it is to observe their fondness towards their young ones, the anxiety they display in providing their wants and the hazard and the risk, to which they run to rescue them from danger. Now if such is the readiness on the parts of the birds and beasts to obey the commands of nature, how much must it be incumbent on you, endowed as rational beings with superior faculties, to discharge faithfully that duty you owe to your children speaking in a philosophical point of view, we are the children of that Omnipotent Being who created this world, our father and mother are to be considered as tools in His hand for our birth. If you admit this philosophy, I am sure, you can not but agree with me, when I say, that with regard to infants, the fathers are as sole guardians appointed by God Almighty to look after their welfare. The natural right, therefore, which He has vested in a parent is nothing more than a delegation of His own power to bring up the little infants according to His will.

Now one might naturally feel inclined to enquire what is that will? I would emphatically reply, that it is, that every nation should offer homage to their own religion and bring up their children according to its tenets. To support this doctrine, I beg to explain my views as far as my humble judgment will admit. There is a diversity of opinion with regard to religion, some say, that it is of human origin, others very properly affirm, that is revealed by God, and my conviction is that it certainly owes its existence from Him, otherwise it could not have extended its sway over the whole universe. Although every nation has its own form to perfrom their worship, the object and end are the same, whether it is of a Hindu, a Jew, a Christian or a Mohamedan. Now the Almighty God, who is Omnipotent, Omnipresent, and Omniscient, must have known, that these respective nations have their own respective forms of religion with which they worship Him, thus knowing it, if he would instruct a portion of his children to the care of Hindu parents, I necessarily come to the conclusion that it is His will, that they should be brought up in conformity to the religion, habits and customs of the Hindus . Gentleman, if you think, that I have not erred in my reasoning, and not justified in charging you of sacrilege, say, the breach of God Almighty, if you send your daughters for education to a school, where the system of tuition is entirely prejudicial to your religion, to your habits, and to your customs. pray, let me beg of you to ponder upon these points calmly, before you insist on keeping your daughters in that school. I have no ill will against those, who have advised you to this sacrilegious undertaking, but as you are my own countrymen, whether I differ with you in opinion is of little consequence. I beg most earnestly that you will seriously take into consideration the duty you owe to your relations and friends, and say how far you are justified by the laws of your country to encourage that system of education, which is given evidently with a view to deprive you here after of the domestic happiness, which every man considers, is a blessing far superior to many which God has bestowed upon us in this sublunary world.

I remain, gentlemen

Hurrish Chunder Turkolonkar

Elsewhere will be found a letter, under the signature of HURRIS CHUNDER TARKALANKAR whether the name be a real or a

fictitous one, we do not know, but the communication to which it is appended is badly to be expected from the pen of one of the fraternity of Tarkalankars and Vidyalankars. We, therefore, publish it not as the genuine production of a veritable Bhattacharjee, but as embodying some of the objections urged by the large section of the Hindu community, who are opposed to Mr. Bethune's school, which has never mustered more than fourteen girls, though it has now been in existence for more than a month and which from all accounts that we receive, does not appear to be in that at flourishing state, in which that Honorable gentleman expected it would be, after it is once established. There has been no further accession of pupils from the families of persons resident within the town, while many of the friends of those with whom Mr. Bethune has habits of mere frequent intercourse have discontinued sending their female children or wards to it. The number of withdrawals, with which we are acquainted, is seven, to wit—

Baboo Govind Chunder Goopto	2
Baboo Hurinarain Dey	1
Baboo Debnarain Dey	1
Baboo Harrocoomar Dey	1
Baboo Harro Mohan Chatterjee	1
Baboo Komullochan Bagchi	1
	7

while others such as Baboo Dwarkanath Goopto, Hemnath Roy Coylas Chunder Bose have never, we understand, sent their children to the female School. But their places, however, have been partly filled up by accession from other quarters and the attendance of the girls for the last three days of the past week, was between 12 and 13. The following, therefore, is a revised list of the parents and guardians to whom our correspondent addresses, which we have prepared from private sources of information, and which we put forth with the same diffidence as before :-

Baboo	Ramgopal Ghose	1 Girl.
"	Ishan Chunder Bose	1 "
"	Nilcomal Banerjee	1 "
"	Pearychand Mitra	1 "
"	Russicklal Sen	1 "
"	Madhabchunder Mullick	1 "
"	Madan Mohan Tarkalankar	1 "
"	Peary Mohan Dey	2 "
"	Shumbhoo Nath Pandit	1 "
"	Gobind Persad Pandit	1 "
"	Neelmony Dutta	1 "
"	Gooroochuran Das	1 "
		13

Thus it is clear, that neither Mr. Bethun was right in his calculation of the extent of support which he was to obtain for his school, nor the Harkara's little band of patriots so staunch withal as to continue patronage of an institution which is inspiring that confidence so essential to its stability and prosperity. He has been led astray by a precipitate zeal and inaccurate information. One of the native gentlemen named above, who still continues to send his daughter to the new school, has , we are informed, written to him, saying that unless the management of the institution was thoroughly purged and reformed he, too, will be obliged to withdraw her from it; and another, we hear, has been requested by Mr. Bethune to give him suggestions in writing as to the best means of resuming it from an early grave. If already cognizant of the errors which he has committed ; we shall be glad to see that they are corrected.

সংবাদপত্রে প্রকাশিত উপরি উক্ত চিঠিতে এবং সংবাদে তখনকার সমাজ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা করা যায়। তখন মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো নিয়ে সমাজে তুমুল আলোড়ন হয়েছিল। সেই সময় দৃঢ়চেতা শম্ভুনাথ স্বীয় সিদ্ধান্তে অবিচল থেকে প্রাণাধিক প্রিয় কন্যা মালতীকে উক্ত বালিকা বিদ্যালয়ে (বেথুন স্কুলে) প্রথমেই ভর্তি

করিয়েছিলেন এবং মালতী বেথুন স্কুলে শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিল। বেথুন স্কুলকে কেন্দ্র করে শম্ভুনাথের, বেথুন সাহেব এবং বিদ্যাসাগর উভয়ের সাথেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বিহারীলাল সরকার তাঁর বিদ্যাসাগর বইতে বেথুন স্কুলের প্রথম পুরস্কার বিতরণী সভার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন যে "শম্ভুনাথ পণ্ডিত বেথুন স্কুলে সোনার বালা পুরস্কার দিয়েছিলেন, সেই বছর বিদ্যাসাগর দিয়েছিলেন চিক — এইখানেই বিদ্যাসাগরের সাথে শম্ভুনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়।" পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাই দুজনের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে দুজনেরই জন্মসাল ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দ।

মালতীকে উপলক্ষ করে শম্ভুনাথ ও বেথুনের মধ্যে কিছু পত্রালাপ হয়েছিল যার মধ্যে দুটির কিয়দংশ নিচে দেওয়া হল ঃ

১

চৌরঙ্গী

৯ই জুলাই ১৮৪৯

.... কিছুদিন পূর্বে আপনি আপনার কন্যার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মিসেস রিড্‌স ডেলকে যে পত্রোত্তর প্রেরণ করিয়াছিলেন তিনি তাহা আমাকে দেখাইয়াছিলেন এবং তাহা পাঠ করিয়া আপনার সম্বন্ধে আমার এমত উচ্চ ধারণা হইয়াছিল যে আমি সংকল্প করিয়াছিলাম যে আপনাকে লিখিয়া জানাইব যে আমি আপনার সহিত ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করিতে অভিলাষী। আমার ইচ্ছামত তদ্দণ্ডেই আপনাকে লিখি নাই ইহা ভালই হইয়াছে, কারণ আমার মনে হয় যে এই পত্র আপনি আরও সমাদর পূর্বক গ্রহণ করিবেন যেহেতু এক্ষণে আমার স্কুলে আপনার কন্যা দ্বারা প্রস্তুত এক জোড়া জুতা এতৎসহ প্রেরণ করিতে সমর্থ হইলাম। যদি উহা আমার নামে তাহাকে উপহার দেন তাহা হইলে আমি পরম আনন্দিত হইব। আমি মিসেস রিড্‌স্‌ডেলের নিকট শুনিলাম সে তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠা ছাত্রী এবং তিনি তাহার পাঠে উন্নতি দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত।

শনিবার বা রবিবার ব্যতীত যে কোনদিন প্রাতে মদীয় ভবনে আপনি অবসরমত সাক্ষাৎ করিলে আমি সুখী হইব। আপনি আপনার পত্রে যে সকল মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা আপনার উন্নত হৃদয়ের পরিচায়ক এবং সারবান মত পোষণ করে এবং আপনি সৎসাহসের সহিত দৃঢ়ভাবে তাহা অবলম্বন করিয়া থাকেন। এইরূপ ব্যক্তি যত অধিক হয় ততই বাঞ্ছনীয়।

২

৫ই নভেম্বর ১৮৪৯

.... আমি আপনাকে পরে যেরূপ বলিয়াছি তাঁহাকেও সেইরূপই কহিয়াছি এবং যিনি জানিতে ইচ্ছুক তাঁহাকেই আমি আনন্দের সহিত জানাইব যে আমি আপনার বিষয়ে অতি উচ্চ মত পোষণ করি - কি প্রতিভা সম্বন্ধে কি চরিত্র সম্বন্ধে, এবং আপনার যদি কোন উপকারে আসে আমি সানন্দে যথাসাধ্য করিব।যাঁহাদিগকে আমি বিশ্বাস করি তাঁহাদিগকে আমি সম্পূর্ণরূপেই বিশ্বাস করি।

আপনার বিশ্বস্ত

জে-ই-ডি বেথুন।

পুনশ্চঃ আমি অদ্য প্রাতে আপনার বাটী হইতে আপনার কন্যার প্রস্তুত একজোড়া শ্লিপার জুতা লইয়া আসিয়াছি। উহা আমাকে প্রদত্ত হয় সে এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করে। আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে আমি ও সে উভয়ে মিলিয়া উহা আপনাকে উপহার দিই কিন্তু তাহার প্রথম অভিপ্রায় হইতে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে না পারায় আমি ভাবিলাম আমার পক্ষে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করা শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ হইবে।

১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল বেথুন শম্ভুনাথকে অনুরোধ করেন কলকাতা স্কুলবুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত পিয়ারসনের বাক্যাবলীর নতুন সংস্করণে আইন ঘটিত বাংলা শব্দ ও তার ইংরাজী প্রতিশব্দের একটি তালিকা সংকলন করে গ্রন্থটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য। শম্ভুনাথকে লেখা ওই চিঠিটি নিচে দেওয়া হল।

.........কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটী শীঘ্রই পিয়ার্সনের বাক্যাবলী পুনর্মুদ্রিত করিবেন - উহা ইংরাজী ও বাঙ্গালা শব্দের অভিধান। এইরূপ প্রস্তাব হইয়াছে কতকগুলি পৃষ্ঠায় ও বিচারালয়ে ব্যবহৃত শব্দের তালিকা সন্নিবিষ্ট হইলে উহা অধিকতর উপকারে অসিবে। যদি আপনার এই কার্য্যের অবসর থাকে তাহা হইলে উহার ভার গ্রহণ করিতে আপনাপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি কেহ আছেন বলিয়া আমি অবগত নই। যদি আপনি এই ভার গ্রহণ করিতে পারেন তাহা হইলে সোসাইটীর সম্পাদক মিষ্টার সাইক্স্কে জানাইলে তিনি আপনাকে একখণ্ড পুস্তক পাঠাইয়া দিবেন। কি করিতে হইবে উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

আপনার বিশ্বস্ত

জে-ই-ডি বেথুন।

শম্ভুনাথ সানন্দে এই কাজ গ্রহণ করেন এবং তাঁর সম্পাদনায় গ্রন্থটির মূল্য বহু পরিমাণে বর্ধিত হয়েছিল। কিন্তু এই বই প্রকাশের পূর্বেই বেথুনের মৃত্যু হয়। বড়লাটের আইনসদস্য ভারতবর্ষের সত্যিকারের শুভাকাঙক্ষী এবং বেথুন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা এলিয়ট ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুনের নামে, তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর (১২ই অগষ্ট ১৮৫১) ৪ মাস পরে ১১ই ডিসেম্বর ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে বেথুনের অনুরাগী বন্ধুগণ বেথুন সোসাইটি নামে এক সাহিত্য সভার প্রতিষ্ঠা করেন। শম্ভুনাথ প্রথম অবস্থা থেকেই এই সভার একজন হিতৈষী সভ্য ছিলেন। পরে তিনি এ সভার অন্যতম সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন এবং আমৃত্যু ওই পদে বহাল ছিলেন।

শম্ভুনাথকে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ নিতে দেখা যায়নি। তবে তিনি সর্বদাই জনসাধারণের হিতসাধনে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি British Indian Association-এর সাথে যুক্ত ছিলেন। কলকাতায় British Indian Association সভা ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে ৩১ অক্টোবর তারিখে স্থাপিত হয়। পূর্বে কলকাতায় জমিদারদের হিতকল্পে এবং তাদের জমিদারীর আয়ের সুখ সুবিধার জন্য স্বর্গীয় প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে Land Holders' Society নামে এক সভা স্থাপন করেন। বক্তৃতা, আন্দোলন এবং কর্তৃপক্ষগণের কাছেই অভাব অভিযোগ জানানো এর মূল উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বিলেতে গিয়ে দুজন বন্ধুকে সঙ্গে আনেন। একজনের নাম Mr. Harry এবং আর একজনের নাম Mr. Thomson. এঁরা ভাল বক্তৃতা করতে পারতেন। Thomson সাহেব একজন উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। এঁদের নিয়েই তিনি উক্ত সভা স্থাপন করেন। তারপর ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দে ২০শে এপ্রিল আর একটা সভা স্থাপিত হয়। স্বর্গীয় হরকুমার ঠাকুর মহাশয় উক্ত সভা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম নেতা। ঐ সভার নাম হল Bengal British India Society। তখনকার ফৌজদার বাংলার নবাব নাজিম বাহাদুরের কুঠীতে ঐ সভা বসত। পরে ঐ বাড়ী ভি. গুপ্ত এণ্ড কোং কিনে নিয়েছিল। প্রধানত উন্নতিশীল সাধারণ শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায়ই এর সভ্য হয়। তরুণ সম্প্রদায়কে তখনকার দিনে Young Bengal বলা হত। বস্তুত তারাই দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রথম যাত্রী (Pioneer). কেবল মাত্র জমিদার শ্রেণীর লোকই তাদের স্বার্থ বজায় রাখবার উদ্দেশ্যে Land Holders' Society স্থাপন করেছিল এবং জমিদারগণই এর সভ্য ছিলেন। কিন্তু Bengal British India Society-তে বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত সাধারণ সকলেই সভ্য হয়েছিলেন এবং দেশের ধনী, দরিদ্র, জমিদার ও প্রজা প্রভৃতির সর্বজনীন হিতকল্পেই এই সভা স্থাপিত হয়েছিল।

কিছুদিন বাদে উভয় দলই দেখল যে একত্রে যদি কাজ করা যায় তবে দেশে একটা বলশালী সভা স্থাপিত হতে পারে। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর শুভ সম্মিলনে British Indian Association গঠিত হল। রাজা রাধাকান্ত দেব, সভাপতি, রাজা কালীকৃষ্ণ দেব, সহসভাপতি, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, হরকুমার ঠাকুর, প্রসন্ন ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ দে, হরিমোহন সেন, রামগোপাল ঘোষ, উমেশচন্দ্র দত্ত, কৃষ্ণ কিশোর ঘোষ, জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়গণ সভ্য ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দিগম্বর মিত্র মহাশয়েরা সম্পাদক ছিলেন। ঐ সভার মতামতকে গভর্নমেন্ট মর্য্যাদা দিতেন। এই সংসদকে এক প্রকার শাসক শাসিতদের মুখপাত্র দ্বিভাষী দূত (Interpreter between the rulers and the ruled) বলা যায়।

সভ্যগণ সাধারণের হিতার্থে কাজ করতেন এবং পরস্পরের মধ্যে কপটতা ও স্বার্থপরতা ছিল না। মতদ্বৈত হলে পরস্পর সামঞ্জস্য করে নিতেন। কাজপাগল শম্ভুনাথ শুধু সভ্য হয়ে থাকতে সন্তুষ্ট না হ'য়ে British Indian Association এর মুখপত্র National Indian Association এর প্রথম সম্পাদক পদ গ্রহণ করেছিলেন এবং যোগ্যতা সহকারে এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

ওকালতির সনদ প্রাপ্ত হয়ে শম্ভুনাথ সদর দেওয়ানী আদালতের criminal বিভাগে ওকালতি আরম্ভ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যে সফল দু এক জন ব্যবহারজীবীর অন্যতম পরিগণিত হন। দু এক বছরের মধ্যে তাঁর মাসিক রোজগার দাঁড়ায় মোটামুটি ১০০০০ টাকায়,কিন্তু এই অবিশ্বাস্য সফলতাও তাঁর মনে উৎফুল্লভাব পুরোপুরি আনতে পারেনি, বিজাতীয় বিবাহের ফলে তাঁর নিজের আত্মীয় পরিজনদের থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ছিলেন। এদিকে তাঁর বাঙালী স্ত্রী তাঁকে যেমন আদর্শ সহধর্মিণীর মতো সর্বদিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করছেন, তেমনি তাঁকে বোঝাচ্ছেনও তাঁর নিজ সম্প্রদায়ের সাথে যোগাযোগ রাখা উচিত। এও বোঝাচ্ছেন নিজ সম্প্রদায়ের কোন মেয়েকে বিয়ে করলে ছিন্ন সম্পর্ক জোড়া লাগার সম্ভাবনা প্রবল। একরকম পত্নীর উৎসাহ ও পরামর্শেই শম্ভুনাথ নিজ সম্প্রদায়ের কোন মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি হ'য়ে যান এবং লক্ষ্ণৌ, যেখানে তাঁর নাড়ীর টান রয়েছে, নিবাসী স্বরূপ রানীর সাথে ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে। এতে তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা মালতীরও নিজ জাতে বিয়ে দেবার সুবিধা হয়। মালতীর বিয়ে হয় ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে এক সপ্রু পরিবারে। মালতীর বিয়ে

হয় খুব জাঁকজমক করে। তিনদিন ধরে খাওয়া দাওয়া হয়। খবরের কাগজে ফলাও করে তা ছাপাও হয়। এই বিয়েতে তখনকার দিনের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

মালতীর বিয়ে উপলক্ষে তখনকার দিনের একটি বিশেষ কাগজে প্রকাশিত সংবাদ ছিল নিম্নরূপ—

সংবাদ প্রভাকর ২৩শে মাঘ ১২৫৮, ৪ ফেব্রুয়ারী ১৮৫২

শুভ বিবাহ

আমরা অত্যাহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে ভবানীপুর প্রবাসী বহু শাস্ত্রবিশারদ সর্ব্বপ্রিয় সুবিখ্যাত বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাশয় গত ১৩ মাঘ রবিবাসরীয় রজনীতে অতি সমারোহপূর্ব্বক স্বীয় প্রাণাধিকা কন্যার শুভবিবাহ কার্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। এতন্মাঙ্গলিক কর্ম্মোপলক্ষে ১২ই মাঘ শনিবার দিবসে ও রাত্রিতে তিনি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ এবং অন্যান্য জাতীর প্রায় সহস্র ব্যক্তিকে অত্যন্ত সমাদরে আহ্বান করত নানাবিধ উপাদেয় মিষ্টান্ন দ্রব্য ভোজন দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়াছেন। এতদ্রূপ অধিক লোকের আহারে জগদীশ্বর সকলদিগই সুপ্রতুল করিয়াছিলেন। অপিচ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় এবং সামাজিকতার ব্যাপার উৎকৃষ্ট রূপেই হইয়াছিল। এই ব্যাপারে আমাদিগের পণ্ডিতবর পণ্ডিত বন্ধু সর্ব্বাংশেই সুখ্যাতি পাইয়াছেন। আগামী শনিবার তাঁহার গৃহে নৃত্যগীতের এক গুরুতর সভা হইবেক। ইহাতে পণ্ডিতবাবুর ১০, ০০০ দশ সহস্র মুদ্রার ন্যূন ব্যয় হয় নাই।

এরপর নিজের এবং বন্ধুবান্ধবদের আত্মিক উন্নতির জন্য ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে জুন তারিখে শম্ভুনাথ নিজের বাসভবনে সম্ভ্রান্ত ভদ্রগণের উপস্থিতিতে-'জ্ঞান প্রকাশিকা সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। শম্ভুনাথ পণ্ডিত, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কাশীশ্বর মিত্র, প্রসন্ন কুমার মুখোপাধ্যায়, ঈশানচন্দ্র হালদার, কৈলাসনাথ মল্লিক, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বামাচরণ মুখোপাধ্যায়, উমেশ চন্দ্র বসু, উমেশ চন্দ্র মিত্র, চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিদের নিয়ে ব্রহ্মোপাসনার উদ্দেশ্যে ঐ সভার পত্তন হয়। প্রতি সোমবার সন্ধ্যায় শম্ভুনাথের গৃহে সভার অধিবেশন হত। শম্ভুনাথ হন প্রথম সভাপতি। সহসভাপতি ছিলেন অভিন্ন হৃদয় বন্ধু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রথম সম্পাদক ছিলেন হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক একজন অকৃত্রিম বন্ধু হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। প্রথমদিকে এই সভায় আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না। ধর্মসঙ্গীত গাওয়া হত এবং শাস্ত্রপাঠ হত। পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবে এখানে

আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত হয়। সেই সময় - ব্রাহ্মসমাজ নামটিও গৃহীত হয়। তার অব্যবহিত পরে 'জ্ঞানসঞ্চারিণী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে সারগর্ভ প্রবন্ধাদি পাঠ হত। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান ভবনটি নির্মিত এবং ব্যবহৃত হয়। তখন ঠিকানা ছিল ৭১ নং পদ্মপুকুর রোড। পরে ঠিকানা হয়েছে- ৭১, ৭১ বি এবং ৭১ সি পদ্মপুকুর রোড।

৫ই জানুয়ারী ১৮৫৩ তারিখে প্রকাশ হয় হিন্দুপ্যাট্রিয়ট। প্রথম সম্পাদক শম্ভুনাথের বন্ধু গিরিশ চন্দ্র ঘোষ। গিরিশ চন্দ্রের অনুরোধে প্রথম অবস্থা থেকেই তিনি এতে নিয়মিত আইন সন্দর্ভাদি রচনা ও প্রকাশ করতে থাকেন। অবশ্য তিনি এর আগে সংবাদ প্রভাকরেও বেশ কিছুদিন আইনের ওপর বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন।

এদিকে তাঁর ওকালতিতে পসার ক্রমশই বাড়ছে। স্বীকৃতিস্বরূপ ১৮ই মার্চ ১৮৫৩ তে তিনি জুনিয়র গভর্নমেন্ট প্লীডার নিযুক্ত হন। তখন সিনিয়র গভর্নমেন্ট প্লীডার ছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের সুযোগ্য পুত্র রমাপ্রসাদ রায়।

৯ই এপ্রিল ১৮৫৩ তারিখে তিনি এগ্রিকালচারাল এণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়ার সভ্য নির্বাচিত হন। এ সম্পর্কে খবরের কাগজে প্রকাশিত সংবাদ ছিল নিম্নরূপ—

The Hindu Intelligencer - May 30, 1853 (Page - 172)

AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL SOCIETY OF INDIA

The usual monthly Meeting held in the Society's Rooms, Metcalf Hall, on Saturday, 14th of May, 1853. W. G. Rose, Esq, Vice-President, in the Chair. The Proceedings of the last general meeting were read and confirmed ; and the gentlemen proposed on that occasion were duly elected members by ballot, viz. Colonel John Barstow; R. Montgomary, Esq; Captain W.H. Delmain, Artillary; Baboos Kisto Gopal Ghose, Kissen Kishore Ghose, Sumbhu Nath Pandit and Jugoda Nanda Mookherjee.

The names of the following gentlemen were submitted as desirous of joining the society:-

Baboo Ramonee Mohan Chowdhury, zemindar, Rangpore - Proposed by Baboo Pearychand Mitra, seconded by Raja Pratap Chandra Sing Bahadoor.

J. A Mangles, Esq. Civil service Chittagong, proposed by Mr. A. Grote, seconded by Dr. Falconer; Lient H. P. Bishop, Artillery, Dacca -Proposed by Mr. H. T. Raikes , seconded by the Secretary.

Lord William Hay, Civil Service, Simla—proposed by Mr. James Hume, seconded by Dr. Hulfnagle; Joseph Shillingford Esq, Indigo Planter, Purneah, - proposed by Mr. A.E. Russel, C.S. seconded by Mr. Lucas Mackintosh.

ইতিমধ্যে ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজে (১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দেই হিন্দু কলেজের নাম পরিবর্তন করে প্রেসিডেন্সি কলেজ করা হয়) আইন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। মিঃ থিওবোল্ড নামে একজন ব্যারিস্টার প্রথম আইন অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিন্তু তিনি উক্ত কাজে বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেননি। তাঁর স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছিলনা। তিনি উক্ত পদে নিযুক্ত হবার কয়েক মাসের মধ্যে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন। ফলত উক্ত পদের জন্য একজন উপযুক্ত ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। সেই সময় শম্ভুনাথ আইন জগতের একজন বিরল ব্যক্তিত্ব - আইন ব্যবসায়ে বিপুল পসার, মাসিক আয় বাড়তে বাড়তে টাকার অঙ্কে ১৫০০০ টাকার মতো। তখনকার দিনের জিনিষ পত্রের দাম থেকে ১৫০০০ টাকা আর্থিক রোজগারকে সম্যকভাবে বোঝা যাবে। ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী তারিখের সংবাদপত্রে 'বাজার ভাও' এর যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল তার কিছু অংশ নিচে উল্লেখিত হল।

বালাম চাল	ঃ	প্রতিমন ১ টাকা ২ আনা থেকে ৩ আনা
গম	ঃ	প্রতিমন ১ টাকা ৩ আনা থেকে ৪ আনা
অরহর ডাল	ঃ	প্রতিমন ১ টাকা ৯ আনা থেকে ১০ আনা
উত্তম গাওয়া ঘি	ঃ	প্রতিমন ২৭ টাকা থেকে ২৮ টাকা
মাঝারি চিনি	ঃ	প্রতিমন ৯ টাকা ৬ আনা থেকে ৮ আনা
হলুদ	ঃ	প্রতিমন ৩ টাকা থেকে ৩ টাকা ৪ আনা

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের এসব জিনিস পত্রের দাম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত মোটামুটি বজায় ছিল।

অন্যদিকে তিনি তখন সরকার মনোনীত জুনিয়র গভর্নমেন্ট প্লীডার। আবার হিন্দু পেট্রিয়ট, সংবাদ প্রভাকর প্রভৃতি কাগজে আইনের ওপর সন্দর্ভাদি রচনা

নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে বিদ্বৎ সমাজে তখন তাঁর ঈর্ষণীয় পরিচিতি। এহেন শম্ভুনাথকে আইন অধ্যাপক পদের জন্য উপযুক্ত ভাবাইতো স্বাভাবিক। উপরন্তু পিয়ার্সনের বাক্যাবলীর ওপর অপূর্ব কাজ করে তিনি শিক্ষা পরিষদের সাথে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত। এই বিষয়ে শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক ১১ই জানুয়ারী ১৮৫৫ তারিখ সম্বলিত পত্রে শম্ভুনাথকে উক্ত পদ স্বীকার করার জন্য অনুরোধ জানান। পত্রটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য,যা নিচে দেওয়া হল,

"শিক্ষাপরিষদের আদেশক্রমে আমি আপনাকে জানাইতেছি যে প্রেসিডেন্সি কলেজে নূতন বন্দোবস্ত অনুসারে একজন ব্যবস্থাশাস্ত্রের অধ্যাপকের প্রয়োজন হইবে। এই অধ্যাপকের রেগুলেশন আইন এবং মফঃস্বলস্থ বিচারালয়ের পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। এইরূপ সম্মানজনক ও উচ্চপদের জন্য যথোপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচন করিতে অগ্রসর হইয়া পরিষৎ দেখিতেছেন যে আপনার অপেক্ষা যোগ্যতর কোন ব্যক্তিকে তাঁহারা উক্ত পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করিতে পারেন না, যদি অবশ্য আপনি ঐ পদ গ্রহণ করিতে স্বীকার করেন।

শিক্ষা-পরিষদের কেবল সুপারিশ করিবারই ক্ষমতা আছে, নিয়োগের ক্ষমতা নাই। অতএব প্রেসিডেন্সি কলেজের আইন-অধ্যাপকের পদের জন্য আপনাকে মনোনীত করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিবার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি।"

শম্ভুনাথ এই পদ গ্রহণে সম্মতি দেন এবং মাসিক ৪০০ টাকা বেতনে তিনি ওই পদে নিযুক্ত হন। তিনি দু বছর এই পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে তিনি সর্বদাই সজাগ থাকতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে তখন ইংরাজী জানা মেধাবী ছাত্রের ভিড়। আইন ব্যবসায়ও তখন প্রতিষ্ঠিত এবং সম্মাননীয় পেশা। তথাকথিত শিক্ষা ব্যবস্থায় স্কুলের গন্ডি না-পেরোনো শম্ভুনাথ হিন্দুকলেজে আইন অধ্যাপক হিসাবে এই বিভাগে প্রথমাবস্থা থেকে যোগ দিয়ে যে শিক্ষার ধারা প্রবর্তন করেছিলেন তা তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে আদর্শ হিসাবে গণ্য। সে সময়ে আইন বিষয়ের ওপর পুস্তকও অপ্রতুল ছিল। তাই তিনি ছাত্রদের সুবিধার্থে তাঁর আইনবিষয়ক বক্তৃতাগুলির কিছু কিছু মুদ্রিত ও প্রকাশিত করে ছাত্রদের বিতরণ করতেন। জানা যায় এরজন্য যা খরচ হতো তা তিনি মাসিক যে ৪০০ টাকা বেতন পেতেন তাতেও সংকুলান হতো না। তাঁর ওকালতি ব্যবসায়ের আয় থেকে ভর্তুকি দিতে হত। দুর্ভাগ্যবশত তাঁর প্রকাশিত বক্তৃতার কোন কিছু পাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দ শম্ভুনাথের জীবনে আরও অর্থবহ। এই বছরে তাঁর কাশ্মীরি

পত্নী স্বরূপরানীর গর্ভে তাঁর পুত্র প্রাণনাথের জন্ম হয়। ইনিও খুব কৃতী ছিলেন। ইনি সংস্কৃত কলেজ থেকে সংস্কৃত নিয়ে এম এ পাশ করেন এবং সরস্বতী উপাধি লাভ করেন। এরপর ওকালতি পাশ করে আইন ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন। ইনি প্রসন্ন কুমার ঠাকুর বৃত্তিভোগী অধ্যাপক হয়ে বহু সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে বিখ্যাত হয়ে আছেন। ইনি ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। এঁর নামানুসারে কলকাতায় প্রাণনাথ পণ্ডিত লেন নামে একটি রাস্তার নামকরণ হয়। ইনিও বেশ কয়েকটি পুস্তক রচনা করে গেছেন। ইনিও তাঁর বাবার মতো স্বল্পায়ু ছিলেন। ৩৭ বছর বয়সে ২৬-১০-১৮৯২ তারিখে ইনি দেহত্যাগ করেন।

১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দকে আরও মনে রাখার মতো এইজন্য যে এই বছরেই বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় এবং প্যারীচরণের 1st Book of English প্রকাশিত হয়। দুটি বই শিক্ষার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী বলা যায়। ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বিধবাবিবাহ সম্পর্কে বিদ্যাসাগর প্রথম পুস্তিকাটি প্রকাশ করেন। এই বইতে বিধবাবিবাহের পক্ষে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখিয়ে সমাজে তা চালু করার জন্য আবেদন জানানো হয়। কয়েকদিনের মধ্যে ১৫০০০ কপি বই শেষ হয়ে যায়।

৫/১২/১৮৫৫ তারিখে প্রথম বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ, এই বিয়ের চার জন পাল্কীবাহকের মধ্যে একজন ছিলেন কাশ্মীরি পণ্ডিত শম্ভুনাথ। তিনি বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রায় প্রতিটি বিধবাবিবাহেই তিনি উপস্থিত থেকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের সাথে শম্ভুনাথের হৃদ্যতা ছিল অপরিসীম। তখনকার সময়ে বহু সমাজসংস্কারমূলক কাজে দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। যার দুএকটি হল মদ্যপান নিবারণী সমিতি, বেথুন সোসাইটি, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্মৃতিরক্ষা কমিটি ইত্যাদি।

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান হয় এবং ভারতের শাসনব্যবস্থা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন হয়। ভারতসচিবের নির্দেশানুযায়ী বড়লাট রাজপ্রতিনিধিরূপে ভারতীয় প্রশাসন পরিচালনার সর্বোচ্চ নিয়ামক বলে ঘোষিত হন। মহারানী ভিক্টোরিয়ার ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘোষণাপত্রে ইংরাজ ও দেশীয়গণের তুল্য অধিকার ঘোষিত হয়েছিল। এর ওপর ভিত্তি করে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েশন, ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আবেদন করেন সর্বোচ্চ আদালতে দেশীয় বিচারপতি নিয়োগের নিয়ম প্রবর্তন করার জন্য।

তৎকালীন গর্ভনর জেনারেল লর্ড ক্যানিংও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উদারতায় এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে সুশিক্ষিত দেশীয় বিচারপতিগণ সর্বোচ্চ আদালতে ইংরাজ বিচারপতিগণের পাশে বসবার সম্পূর্ণ যোগ্য।

ভারতের শাসনব্যবস্থা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আসার পর বিচার ব্যবস্থাতেও আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট কলকাতা, বোম্বে এবং মাদ্রাজ রেসিডেন্সিতে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা করার কথা ঘোষণা করে এক আইন প্রবর্তন করা হয়। এই আইন অনুসারে ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই মের Letters Patent দ্বারা হাইকোর্টের এলাকা এবং ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে কলকাতা হাইকোর্টের জন্ম হল ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দের ১লা জুলাই। উঠে যাওয়া সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার বার্ণেস পিকক্ কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। তৎকালীন সুপ্রীম কোর্টের মর্যাদাগত অবস্থান এই গ্রন্থে অন্যত্র আলোচিত হয়েছে।

উচ্চপদে উপযুক্ত ভারতীয় এবং ইংরাজদের সমতুল্য গণ্য করার ঘোষণা এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েশনের প্রচেষ্টায় হাইকোর্টে একজন দেশীয় জজ নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ যখন সিনিয়র গভর্নমেন্ট প্লীডার তখন শম্ভুনাথ জুনিয়র গভর্নমেন্ট প্লীডার। রমাপ্রসাদ অসুস্থতাজনিত কারণে শয্যাশায়ী হ'য়ে পড়ায় তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং তাঁর স্থলে শম্ভুনাথ ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে সিনিয়র গভর্নমেন্ট প্লীডার পদে উন্নীত হন। হাইকোর্টের প্রথম প্রধানবিচারপতি স্যার বার্নেস পিকক্ শম্ভুনাথের প্রতিভা এবং ন্যায়পরায়ণতায় বিমুগ্ধ ছিলেন এবং হাইকোর্টের প্রথম দেশীয় জজ পদের জন্য তাঁর নাম প্রস্তাব করেন। উকিল হিসাবে তখন শম্ভুনাথের আয়ের অংক বিশাল। মাসিক ১৫০০০ টাকা আয় ছেড়ে ৪০০০ টাকার মতো জজের পদের বেতনে যেতে তাঁর প্রাথমিক দ্বিধা ছিল। কিন্তু বাংলা গভর্নমেন্টের তদানীন্তন সেক্রেটারী সুহৃদয় স্যার অ্যালি ইডেনের বিশেষ পরামর্শে এবং সর্বোপরি দেশীয়দের এইপ্রকার উচ্চপদ প্রাপ্তির পথ সুগম করবার অভিপ্রায়ে মানুষ শম্ভুনাথ এই পদ গ্রহণ করতে স্বীকৃত হন। রাজপ্রতিনিধি লর্ড এলগিন তাঁর নিয়োগ সমর্থন করেন। তদনুযায়ী ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর ভারতবর্ষে তদানীন্তন সেক্রেটারী অফ ষ্টেট স্যার চার্লস উড নিম্নোদ্ধৃত পত্রসহ মহারানীর নিয়োগপত্র পাঠিয়ে দেন।

ইণ্ডিয়া অফিস, ১৮ই নভেম্বর ১৮৬২

মহাশয়,

আমি মহারাজ্ঞীর নিকট অতীব আনন্দ সহকারে আপনাকে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। আপনি যেরূপ সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন আপনি উক্ত পদের সম্পূর্ণ যোগ্য এইরূপ ধারণা আছে, এবং ইহা অত্যন্ত সন্তোষের বিষয় যে তাহার দেশের সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণে আমি একজন ভারতবাসীকে প্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ পাইলাম যিনি তাঁহার কর্তব্যকর্ম যোগ্যতা ও নিরপেক্ষতার সহিত সম্পাদিত করিবেন আমার এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস আছে।

আপনার অনুগত ভৃত্য—

চার্লস উড।

শম্ভুনাথ ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী প্রথম ভারতীয় হিসাবে এই পদে যোগদান করেন। সমস্ত দেশবাসী এই নিয়োগে আনন্দ প্রকাশ করে। হাইকোর্টের অন্যতম সরকারী উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই নিয়োগে আনন্দ প্রকাশ করে তাঁর গৃহে এক মহাভোজের আয়োজন করেন এবং সেই ভোজে অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণ কিশোর ঘোষ প্রভৃতি হাইকোর্টের শ্রেষ্ঠ উকিলগণ যোগদান করেছিলেন এবং শম্ভুনাথকে সম্বর্ধিত করেছিলেন।

অনেক জায়গায় উল্লেখিত আছে যে রমাপ্রসাদ রায় প্রথম দেশীয় বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ পত্র পান এবং বিচারপতি পদে যোগদান করার আগেই তিনি মারা যান। এ প্রসঙ্গে কলকাতা হাইকোর্টের শতবার্ষিকি উপলক্ষে প্রকাশিত ক্রোড়পত্রে মাননীয় প্রাক্তন বিচারপতি রমাপ্রসাদ মুখার্জীর লেখা প্রবন্ধ "Peep into past" এর কিয়দংশ উল্লেখ করা যেতে পারে—

"It is generally stated that Rama Prasad Roy, a son of the great leader of Indian Renaissance, Raja Ram Mohan Roy, and the then Government Pleader and the undoubted leader of the Legal profession in Bengal, had been appointed the first Indian Judge when the High Court was established but he could not take his seat as he passed away after appointment. This is not correct. When the names of the first Judges were gazetted in the London Gazette on the 13th May 1862 his name was not included. When the first announcement of the names was made in India one of the Calcutta papers published the news with the remark "There is thus no native Judge....."

The announcement in the London Gazette on the 13th May 1862 was in the following terms :-

"Sir Barnes Peacock, Knight,Chief Justice of the Supreme Court, to be Chief Justice of the High Court; and Sir Charles Robert Mitchell Jackson, Knight, Sir Mordant Lawson Wells, Knight, Judges of the Supreme Court; Henry Thomas Raikes, Esqr., Charles Binny Trevor, Esqr., George Loch, Esqr., Henry Vincent Bayley, Esqr. and Charles Steer, Esqr., Judges of the Sudder Dewany Adawlut to be Judges of the High Court. And the Queen has been graciously pleased to give orders for the appointment of John Paxtor Norman, Esqr. and Walter Morgan, Esqr. Barristers at Law; and Francis Baring Kemp, Esqr., Walter Scott Seton-Karr, Esqr. and Loius Stuart Jackson, Esqr. of the Bengal Civil Service, to be Judges of the said High Court."

Indian Judges could not be appointed at the stage as they would be qualified only after being enrolled in the new Court. It was noticed on the 3rd July 1862–"The Judges will select from the Sudder Vakeels such persons as they consider qualified to plead before the High Court. A native Judge will be nominated from among these Vakeels and the full strength of the Bench, of fifteen Judges will thus be complete. Meanwhile the former Sudder Judges will confine themselves to appellate cases and clear off the arrear of years".

উপরি উক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে শম্ভুনাথই প্রথম ভারতীয় যিনি সর্বোচ্চ আদালতে জজের পদে যোগদানের নিয়োগপত্র পান।

তাঁর নিয়োগে দেশবাসীর প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন কাগজে প্রকাশিত খবরের মাধ্যমে কিছুটা ধারণা করা যায়। যার দুএকটি পুস্তকের পরিশিষ্ট অংশে পুনরুল্লেখিত হল। জজ হিসাবে দেশীয়দের পরিধেয় কি হতে পারে - এ নিয়েও খবরের কাগজে জল্পনা চলে। জনসাধারণের সাধারণ অভিমত ছিল মাথায় দেশীয় শামলা (চিকনের কাজ করা কিনারাদার সরু শালের পাগড়ি) এবং গায়ে প্রাচ্যে ব্যবহৃত জোব্বা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে শম্ভুনাথ শিষ্টাচার মেনে ইংলিশ গাউনই পরেছিলেন।

স্বপদে যোগদান করে প্রথম দিন থেকেই তিনি স্বচ্ছন্দ ছিলেন। প্রথম দিনেই তিনি Mr. Kemp এর (যিনি ঐদিন হাইকোর্টের একজন অন্যতম জজ) পূর্বে দেওয়া একটি রায়কেবাতিল করে দেন। প্রথম দিন থেকেই তিনি জনসাধারণের তাঁর

সম্বন্ধে লালিত উচ্চাশাকে আপন কার্যকলাপ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন।

২৬শে মার্চ ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে ভবানীপুর এলাকায় (কিছুদিন আগেও যা পোড়াবাজার বলে লোকমুখে পরিচিত ছিল) এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ঘটে। কয়েক ঘণ্টা ধরে এর আগ্রাসন চলে। প্রবল হাওয়া ঘৃতাহুতির কাজ করে। দ্বিশতাধিক কুটীর, দোকান এবং কয়েক ডজন ছোট পাকা বাড়ী পুড়ে ছাই হয়ে যায়, বেশ কিছু জীবন হানি হয় এবং কয়েক শত লোক তাদের সমস্ত কিছু হারিয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

শম্ভুনাথ ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী জজের পদে আসীন হয়েছেন। নতুন কর্মস্থলে গুরুত্বপূর্ণ পদে ব্যস্ততা থাকা খুবই স্বাভাবিক। এতদ্‌সত্ত্বেও শম্ভুনাথ তাঁর সহজাত সামাজিক দায়বদ্ধতায়, স্থানীয় দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের সহযোগিতায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেবার কাজে। নিজে প্রথমে ৫০০ টাকা দিয়ে একটি ফাণ্ড গঠন করলেন। তাঁর অনুরোধে এতে বহুলোক মুক্তহস্তে দান করলেন। কিন্তু প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল সীমিত। তাই তিনি কৃষ্ণ কিশোর ঘোষ এবং রেভাঃ জে মলিন্সকে নিয়ে সাহায্যের জন্য জনসাধারণের কাছে খবরের কাগজে আবেদন রাখেন এবং নিজের প্রভাবও কাজে লাগান। আবেদনটি ছিল নিম্নরূপ—

APPEAL

On the 26th of March, a most calamitious fire occurred in Bhowanipore, the southern suburb of Calcutta. Aided by a high wind it burnt for many hours and spread its ravages over a large district, destroying especially large number of wood-stores with all their contents. It extended nearly a quarter of a mile in length and consumed nearly two thousand huts and shops with several dozens of small pucca houses. Such a fire has not been known in that position of Bhowanipore for a hundred years. Several lives were lost and hundreds of persons have lost their all, driven from house and left without resources and almost without friends.

For relieving to some extent the large number of people who have suffered by this accident, a subscription has been raised on the appellate side of the High Court and in Bhowanipore, amounting at this time to 3,139 rupees, as the subjoined list will show. Of this sum more than 2,600 rupees have already been distributed. Many who have claims similar to those who have been

so aided yet remain to be relieved and it is calculated that without at least a sum of one thousand five hundred rupees in addition to the sum already subscribed, proper and equal relief cannot be granted to all who deserved to be assisted. It was at first thought that no appeal to the public in general should be made if it could be avoided, by raising the necessary amount among gentlemen resident in the locality on whom the sufferers have special claim.

The undersigned however now find they are compelled to make this appeal to the generous public, who, it is hoped, will respond to the call hereby made to them on behalf of the homeless poors. The undersigned will be glad to receive any sum that may be forwared to them for this purpose.

SHAMBHOO NATH PANDIT,
KISSEN KISHORE GHOSE,
REV, J. MOLLENS

আবেদনে সাড়া দিয়ে বহুলোক আর্থিক সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে মহারাজ রাজেন্দ্র প্রতাপ শাহী (৫০০ টাকা), বাবু কৃষ্ণ কিশোর ঘোষ (৫০০ টাকা), The Hon'ble W. S. Seton (১০০ টাকা), দ্বারকানাথ মিত্র (১০০ টাকা), অন্নদাপ্রসাদ ব্যানার্জী (৫০ টাকা), রমেশ চন্দ্র মিত্র (১০ টাকা), চন্দ্রমাধব ঘোষ (১০ টাকা), বাবু ভবানী প্রসাদ দত্ত (৫০ টাকা), হরিশ চন্দ্র চ্যাটার্জী (১০ টাকা) মুন্সী আমীর আলি (১৫০ টাকা), R T Allan Esq (১০০ টাকা), G. Gregory Esq (৫০ টাকা), H. Stanforth Esq (১০০ টাকা), প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি যাঁরা শম্ভুনাথের খুব ঘনিষ্ট ছিলেন, বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

শম্ভুনাথের যথার্থ চেষ্টায় এবং তাঁর বন্ধুদের সহায়তায় সুষ্ঠুভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়েছিল। তাঁর এই ঐকান্তিক প্রয়াস সেই সময়ে সকলের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছিল।

১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী শম্ভুনাথ এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হন, যে পদ তিনি আমৃত্যু বজায় রেখেছিলেন।

১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে শম্ভুনাথ এবং বাবু জগদানন্দ মুখার্জী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো মনোনীত হন।

ইতিমধ্যে (১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ - ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দ) শম্ভুনাথের কাশ্মীরি স্ত্রী স্বরূপরানীর গর্ভে দুই কন্যা (সরস্বতী এবং মোহিনী) এবং এক পুত্র (বিশ্বম্ভর নাথ) জন্মগ্রহণ করে। এদের প্রকৃত জন্মসাল জানা যায়নি। তবে এক মেয়ের দেরাদুন নিবাসী পণ্ডিত পুস্করনাথ তন্‌খা এবং অন্য মেয়ের লক্ষ্মৌ এর এডভোকেট, পণ্ডিত ইকবাল নারায়ণ মুসলদান এর সাথে বিবাহ হয়। বিশ্বম্ভরনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজ

থেকে বি. এ. পাশ করেন।

ইংরাজদের কাছ থেকে ভারতীয়রা ভাল কিছু শিখলেও অনুকরণ করতে গিয়ে কিছু কিছু বদভ্যাসও তাদের মধ্যে এসেছে—মদ্যপান করে নেশাগ্রস্ত হওয়াটা এর অন্যতম। সেই সময় যুবক সম্প্রদায়ের একটা বিরাট অংশ এর শিকার হয়েছিল—যা একটা সামাজিক সমস্যায় রূপান্তরিত হয়েছিল। এই সমস্যা দূর করার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ প্যারীচরণ সরকার ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর বঙ্গীয় সুরাপান নিবারণ সভা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে মে প্রেসিডেন্সি কলেজ থিয়েটারে সমিতির প্রকাশ্য অধিবেশনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশব চন্দ্র সেন, গিরীশ চন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি ব্যক্তিত্বের সাথে শম্ভুনাথও উপস্থিত ছিলেন এবং পরে এই সংস্থার কার্যকলাপে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। এই সমিতির উদ্যোগে ৯৩৫৪ জনের স্বাক্ষর সহ সুরাপানের কুফল অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিশন গঠন করার অনুরোধ সম্বলিত একটি স্মারকলিপি সরকারের কাছে ২২.০৩.১৮৬৬ তারিখে পেশ করা হয়। এই স্মারকলিপিতে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ সার্টক্লিফ, বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজ নারায়ণ বসু, হরচন্দ্র ঘোষ, দিগম্বর মিত্র, মহারাজা কালীকৃষ্ণ, জেমস লং উড্রো প্রভৃতির সাথে শম্ভুনাথও সহি করেন এবং স্মারকলিপিটি রাজভবনে পেশ করার জন্য প্রতিনিধিত্ব করেন।

শম্ভুনাথ ছিলেন এই সমিতির একজন উৎসাহী সদস্য। তিনি আমৃত্যু এই সমিতির সাথে যুক্ত ছিলেন। এই সমিতির প্রাণপুরুষ প্যারীচরণ সরকার ছিলেন শম্ভুনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মাদকনিবারণী সভায় তাঁর রাখা বক্তব্য যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে কিনা এসব ছোটখাট ব্যাপারেও তাঁর দৃষ্টি থাকত। এ ব্যাপারে প্যারীচরণের সাথে বন্ধু জজ শম্ভুনাথের একটি পত্রালাপ—

উপরিউক্ত পত্রালাপ থেকে প্রতীয়মান হয় যে শম্ভুনাথ (তখন তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি) তাঁর ব্যস্ততার মধ্যেও মদ্যপান নিবারণীতে কতটা উৎসাহিত ছিলেন। অন্য দিকে তিনি তাঁর বক্তব্যে কতটা যথাযথ ছিলেন তাও বোঝা যায়। যে কোন কাজেই তাঁর এই সম্পূর্ণতা ছিল ঈর্ষণীয়।

শম্ভুনাথ ১৮৬৫-৬৬ খ্রিষ্টাব্দের বেথুন স্কুলের পরিচালন সমিতির সভ্য নির্বাচিত হন। এ সম্পর্কে Bengal Directory & Tradesman Guide 1867 part VI L এতে নিম্নরূপ উল্লেখিত হয়েছে—

Bethune Native Female School, 147, Cornwallis Street Committee of Management (1865-66)

President W.S. Seton Karr

Members, Shambhunath Pandit & Hurrochandra Ghosh

এরপর শম্ভুনাথ ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের fellow নির্বাচিত হন। সেই সময় Faculty ছিল নিম্নরূপ ঃ

Members: President Hon'ble Henry Sumner Maine, L.L.D Burnes Peacock C. J. ; C B Trevor Puine J.; Baboo Prosunnocoomer Tagore; Moulvie Mahamad Wazeah ; William Theobold; F.L. Beauford; Arther Macpherson; N. A. Montriou ; T. H. Cowie; Moulivie Abdool Lateef Khan; Paxton Norman; Lois Jackson; Shambhunath Pandit; George Cambell; Baboo Jaggadanand Mookherjee Roy Bahadur; J. B. Phear; Syed Azeemoodeen Hosein Khan Bahadur.

(Bengal Directory & Tradesman Guide P. 4)

১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারী মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলকাতা হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতির কাছে ব্যারিস্টারি করার আবেদন করেন। কিন্তু দেশীয়-বিদ্বেষী বিচারপতি জ্যাকসন এবং ম্যাকফারসনের মাইকেলের চরিত্র বিষয়ে আপত্তিতে তিনি অনুমতি পাননি। তখন শম্ভুনাথেরই পরামর্শে মাইকেল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সহ কয়েকজন দেশীয় সম্মাননীয় ব্যক্তির কাছ থেকে চরিত্র সম্বন্ধে উপযুক্ত শংসাপত্র যোগাড় করে দাখিল করলেন। ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দের ২ মে কলকাতা হাইকোর্টের সমস্ত জজেরা একমত হয়ে মধুসূদনকে কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি করার অনুমতি দিলেন। বস্তুত শম্ভুনাথের মধ্যস্থতায় এবং আন্তরিক চেষ্টাতেই মধুসূদন ন্যায্য অধিকার লাভ করতে পেরেছিলেন। শম্ভুনাথ একাজকে কতটা গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা

বোঝা যায় বিদ্যাসাগরকে ১১ই এপ্রিল ১৮৬৭ তারিখে এ সম্পর্কে লেখা মধুসূদনের চিঠি থেকে, যার খানিকটা এখানে উল্লেখিত হল ".......Shambhonauth says that our enemies seem to have own the ears of the Judges and that the antidote must be as strong as the poison. He wants you to come to Calcutta. .... Shambhunath said, এ বিষয়ে (অর্থাৎ মধুসূদনের ব্যারিস্টারি করার অনুমতি না মিললে আর মান থাকবে না। ....")

শম্ভুনাথ বিচারক হিসাবে কতটা সার্থক হয়েছিলেন, অমরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর Centinel of Liberty নামক পুস্তকে তার সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করেছেন এইভাবে—

The breadth of Sambhoonath's legal learning and his perception of the changing conditions of the age, led him to be acutely conscious of the deficiencies of the Indian Law of the time in some of its branches. Having this consciousness and having an adequate knowledge regarding appropriate remedies, he tried to adapt the law to the needs of the changing age by his judicial decisions. His eagerness to adopt new concepts has found expression in many of his judgments. Sitting with such a learned judge as Sir Barnes Peacock, Sambhoonath had often the courage and conviction to differ from the views of the Chief Justice in many cases and it must be said after the passage of almost a century that his views were upheld in many cases afterwards.

The Government of the East India Company and then Queen Victoria's Government had ushered a new age with a totally new set political conditions in the country. Expandig trade and commerce were also bringing into existence a new set of commercial conditions. There was, therefore, the need of an Indian Judge who was acquainted with modern needs and modern thought to appreciate the nature of the various problems requiring proper solution and who was a sufficiently good lawyer to put those solutions into form. Sambhoonath Pandit admirably fulfilled all these needs. He was a learned lawyer and he thoroughly understood the political and commercial conditions of his time. So he utilized his experience and legal knowledge to develop the

law in such a way that it could do substantial justice under these new conditions.

His judgement in the case reported in I Weekly Reporter 125 (Civil) unmistakably shows his eagerness to do substantial justice. In this case, he held with Mr. Justice Morgan that a Hindu widow cannot be compelled, without proof of waste, to give security for the value received by her of lands belonging to her husband's estate taken by a Railway Company. Again in the case reported in 1 Weekly Reporter 124(Civil), Sambhoonath Pandit held very justly and equitably that the holder of lakhiraj tenure may claim gradual accretion on the tenure of his property.

The case reported in 5 Weekly Reporter 76 (Civil) was a special appeal heard by Sir Barnes Peacock, H. V. Bayley, J. P. Norman, S. Pandit and G. Campbel, JJ. Sambhoonath Pandit and J.P. Norman dissented from the majority judgment of Sir Barnes Peacock and the two other Judges. It will be profitable to read the judgments of the majority Judges as well as of the dissenting ones in this case.

Reading critically the above judgements in the same case of the two great Judges in the formative period of the Calcutta High Court it is possible to make an estimate of their judicial mind. Sir Barnes Peacock endeavoured to cut the Gordian knot and solve the knotty issue by the sweeping conclusion that verbal evidence is not admissible to show that the parties did not intend that an absolute sale in writing should not operate as such but only as a conditional sale or mortgage. Sambhoonath Pandit, who was fully conversant with the actual condition of the country and the actual literary standard of the man, thought it wise to allow such parol evidence to show that it was not an actual sale but a mortgage. According to the master mind of Sambhoonath Pandit, the condition in India was not convenient for adopting the English Law of Evidence in to. So in the dissentient judgment he struck the note which was accepted in subsequent decisions of the

Calcutta High Court and other High Courts. The general principle that oral evidence is not admissible against a written deed is limited by provisos in Section 92 of the Act. This is now well known to all but when Sambhoonath Pandit rang this discordant note in his dissentient judgement against the majority judgment of the great Chief Justice, he certainly had a firm conviction of the truth of his enunciation. This conviction made him a great Judge. This is a prominent illustration of judicial Valour expressed by the first Indian Judge of the Calcutta High Court.

Sambhoonath Pandit was self made man. By dint of labour he became one of the most eminent Judges of his time and his fame as a Great Judge spread far and wide. His contributions to Indian Law are not Insignificant. Immediately after his death on 6th June 1867 the Government of India not only published a notification expressing sincere regret on the death of the first Indian Judge but concurred with the Chief Justice the he had fully justified the capacity of Indians to fill with credit the highest judicial office.

There is a full-length portrait of him in Judge's robes adorning the eastern wall of the court room No. 5 painted by a German painter. His demeanour, as it appears on the portrait, shows the gravity and sobriety of the Judge and draws respect of the onlookers.

Sitting with Sir Barnes Peacock in the case reported in Sutherland's Weekly Reporter, Volume III, Civil Rulings, Page 83, it was held both by Chief Justice Barnes Peacock and Shambhoonath Pandit that the Court of wards could take an infant and his estate under their protection, notwithstanding the existence of a civil court guardian who was appointed under Act XL of 1858 (Bengal Minors Act) which contained the law on the subject before Act VIII of 1890.

Those were the days when the condition of the raiyats was at a melting point, On one side there was the creation of the

zamindars by the British Government and on the other side there was no specific statute for protection of the tenants. Sir Barnes Peacock and Sambhoonath both made great contributions to this branch of law by their memorable decisions and laid down the basis of the Bengal Tenancy Act and other Tenancy Legislations in other Provinces.

In the case reported in Sutherland's Weekly Reporter, I, Volume 169J, Shambhoonath Pandit held that the raiyat may be protected from enhancement of rent by his long holding at a uniform rate and as the lower court failed to ascertain the said point, the case was remanded.

There was the Civil Procedure Code of the year 1859 (Act VIII of 1859). The Civil Procedure Code is unquestionably the most important legislation on the Statute Book, as it covers vast field and governs the procedure of all classes of suits and appeals, Justice in courts of law must be administered in accordance with a reasonable standard. That standard had to be evolved by these early Judges of the High Court. In the case reported in Sutherland's Weekly Reporter Volume I, Page 161, Sumbhoonath Pandit objected to the qualified form of decree granted by the Principal Sudder Ammen directing realization by attachment only. It was held in that case that a qualified decree directing realisation by attachment only, was not authorized by law and the decree-holder might realize his dues by the sale of the peoperty.

Similarly in the case reported in Sutherland's Weekly Reporter, Volume I, Page 168, Justice Sambhoonath Pandit gave a very resonable and wise decision by holding that where there were several plaintiffs, the refusal or failure of some of them to attend and give evidence did not render the dismissal of the entire suit but judgment might be passed against them only who refused to appear after summons was served on them. His colleague Justice Campbell dissented and held that the entire suit was to be dismissed in view of Section 170 of the Code of 1859. Evidently

the view of Justice Campell was wrong and the third Judge Justice Trevor agreed with Justice Pandit. This Judgement shows a contrast between an Indian Judge nurtured in the Indian Philosophy of law of Dharma and an English Judge brought up in the atmosphere of common and Equity law of England. The Indian Judge said in the above Judgment, "It is neither justice nor equity that while it is allowed that, if one of the plaintiffs in a case like this, commit perjury, he alone can be punished and not all on whose behalf he may have deposed falsely. If the default mentioned in Section 170 is committed by one plaintiff, the right of all other plaintiffs are to be damaged by that default." How impressively, he brought out the ratio decidendi. In this way the principles of the later Civil Procedure Code of 1908 were evolved in the formative era of the Indian Law introduced during the British Period. Sambhoonath's background of legal theory, his views as to law in general, as to the rights and duties which the law should protect, as to the procedure which should be employed to enforce those rights were influenced by his deep knowledge of Hindu Philosophy of law and the Equity of England of which he made a special study as a professor of law.

The nice points of the difficult law of mortgage were also decided by the first Indian Judge of the Calcutta Hight Court. Before the Transfer of Property Act (Act IV of 1882) there was practically no law as to real property in India. A few points were covered by the Regulations and the Acts which were repealed either wholly or in part by Section 2 of the Act IV of 1882, But for the rest of the law, the courts followed the English law, as the rule of justice, equity and good conscience. Here is an illustration. In the case reported in Sutherland's Weekly Reporter, Volume I,Page 175, Sambhoonath held that a foreclosure decree cannot give the mortgagee a title against a person who was not a party to the suit or deprive such person of a right to redeem acquired by purchase of a portion of the mortgaged property.

His contributions in the development of law of agency in India can be assessed from his decision with Justice W. Morgan

in the Reference to the High Court under section 22 of Act XXI of 1863 by the Recorder of Moulmein and Rangoon, reported in Sutherland's Weekly Reporter, Volume IV. It was held there that an agent who deals with another man's goods, as if they belonged to his principal, be answerable to the true owner, notwithstanding that he acts by the command or direction of his principal.

The Indian Contract (Act IX of 1872) came on the statute Book of India on the 1st day September 1872. Before that there was no statutory law regarding agency. So in the formative period, the Law of agency had to be evolved by the judges of High courts on the principles of English Common Law and the law as administered in the courts of Chancery in England. Sambhoonath had a vast knowledge of both the above laws and he successfully applied them in developing the Indian Law of Contract and Agency which is one of the most difficult subjects in Jurisprudence.

তিরোধান

১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই জুন শম্ভুনাথের জীবনের অন্তিম দিন। সামান্য জ্বর এবং একটা ফোঁড়া- পরে যা কার্বাঙ্কলে রূপান্তরিত - একটি অমূল্য জীবনকে স্বমহিমায় পূর্ণ প্রকাশিত হবার আগেই তার মাত্র ৪৭ বছর বয়সে এই পৃথিবী থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। তখন মনে হয় মৃত্যু কত নিষ্ঠুর। ধর্মপ্রাণ শম্ভুনাথ মনে হয় তাঁর অন্তিমক্ষণ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এবং শোনা যায় মৃত্যুর পূর্বদিন একটি উইল (যার কোন অনুলিপি শত চেষ্টাতেও যোগাড় করা সম্ভব হয়নি) প্রস্তুত করালেন এবং ঐ রাত্রে স্ত্রী পুত্রগণকে শয্যাপাশে ডেকে নিয়ে এসে ব্রহ্মোপাসনা করলেন এবং শান্তচিত্তে বীজমন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন। ওঙ্কারধ্বনি করতে করতে বৃহস্পতিবার, ২৪শে জ্যৈষ্ঠ ১২৭৪ বঙ্গাব্দ (৬ই জুন ১৮৬৭) সকাল সাতটায় সজ্ঞানে সাধনোচিত ধামে গমন করলেন।

তাঁর মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হওয়ামাত্র দেশব্যাপী শোক নেমে এলো। সেই দিনই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার বার্ণেস পিকক্ এডভোকেট জেনারেলকে সম্বোধন করে বললেন ঃ-

"এই বিচারালয়ের অন্যতম সুবিজ্ঞ বিচারপতি, জাস্টিস শম্ভুনাথ পন্ডিতের মৃত্যু-সংবাদ ব্যবহারজীবী সম্প্রদায় ও সাধারণের নিকট ঘোষণা করা আজ আমার শোকাবহ কর্তব্য। অদ্য প্রাতে এই শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে। তিনিই প্রথম— বলিতে গেলে একমাত্র ভারতবাসী যিনি হাইকোর্টে বিচারপতির পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। আমার নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিতে হইলে আমাকে যথার্থ বলিতে হইবে এবং বোধ হয় ইহাতে কেবল আমার নহে, আমার সুপন্ডিত সহযোগিগণের মত ব্যক্ত করা হইতেছে যে জাষ্টিস শম্ভুনাথের তিরোধানে আমরা একজন অমূল্য বহুগুণান্বিত বন্ধু ও সহকর্মী হারাইয়াছি এবং জনসাধারণ ও এই বিচারালয় একজন ন্যায়পরায়ণ, সুপন্ডিত ও স্বাধীনচেতা বিচারপতি হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন।"

আপীল বিভাগেও বিচারপতি জ্যাকসন শম্ভুনাথের মৃত্যু উপলক্ষে শোক প্রকাশ করে বলেন, "অদ্যকার কার্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে, যিনি ভারতবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম মহারাজ্ঞী কর্তৃক এই ধর্মাধিকরণে বিচারপতির পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন তাঁহার মৃত্যু-সংবাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমাদের পরলোকগত সহযোগীর সহিত এই বিচারালয়ের ব্যবহারজীবীগণের মধ্যে অনেকেরই আমাদের অপেক্ষা অধিকতর

দীর্ঘকালের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা অত্যন্ত সত্য এবং আমার বিশ্বাস এই বিচারালয়ের অন্যান্য বিভাগেও আমার সহযোগীরা ইহার সমর্থন করিবেন যে, আমরা একজন বহু গুণান্বিত মহামান্য সহযোগী ও বন্ধু হইতে বঞ্চিত হইয়াছি এবং সাধারণ একজন ন্যায়বান সুপণ্ডিত সুদক্ষ এবং সত্যনিষ্ঠ বিচারপতি হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। যখন এতদ্দেশীয়গণের মধ্যে একজনকে এই বিচারালয়ের বিচারপতির পদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হয়, বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিতের যোগ্যতা, সাধুতা ও বহুদর্শিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণসমূহ তাঁহাকেই তখন ঐ পদের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিল। তাঁহার সরলতা, সহৃদয়তা ও সৌজন্যের গুণে তিনি যেমন তাঁহার সহযোগিগণের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন, সেইরূপে ঐ সকল গুণে তাঁহার অন্যবিধ যোগ্যতারও সৌন্দর্যবৃদ্ধি হইয়াছিল।"

অন্যান্য বিভাগের বিচারপতিগণ, জষ্টিস লক, কেম্প, বেলি, এবং সীটনকার ঐ মর্মে শোকপ্রকাশ করে আদালত বন্ধ করেন। জাষ্টিস বেলি বক্তৃতাকালে অশ্রু সম্বরণ করতে পারেননি।

আদালত বন্ধ হবার পর হাইকোর্টের উকিল, মোক্তার এবং শম্ভুনাথের প্রতিভানুরাগী শতশত ভক্ত ও বন্ধু, সিনিয়ার গবর্ণমেন্ট প্লীডার কৃষ্ণকিশোর ঘোষের নেতৃত্বে শবানুগমন করেন।

শম্ভুনাথের মৃত্যু-সংবাদ শুনে তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড লরেন্স শোকে অভিভূত হন এবং সরকারী গেজেটে শোকসূচক ব্ল্যাক বর্ডারসহ নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হয় ঃ-

The Indian Gazette Extra Ordinary announces the following :-

Simla, Monday June 17, 1867

No. 1346

Home Department

Judicial

Notification

The 14th June, 1867.

The Governor General in council has received with sincere regret, official intimation of the death of the Hon'ble Shumboonath Pundit, one of the judges of Her Majesty's High court at Fort William.

The Hon'ble the Chief Justice in communicating this intelligence to the Governor General, has said -"So far as Mr. Justice Shumboonath Pundit was concerned the experiment of appointing a Native Gentleman to a seat in the High Court (who) has a considerable knowledge of his profession and a thorough acquaintance with the natives. I have always found him, upright, honorable and independent, and I believe that he was looked upon by his countrymen with respect and confidence."The interest which, both in India and in England, attaches to the experiment of placing a Native Gentleman in the highest judicial situation on the country, has induced the Governor - General in council to make public the opinion of the Hon'ble the chief Justice, in which His Excellency in council entirely agrees.

C BAYLEY

Secretary to the Government of India

বাস্তবিক বিচারপতিপদে শম্ভুনাথের সাফল্য পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণে অপরাপর ভারতবাসীর নিয়োগ সম্ভবপর করেছিল।

শম্ভুনাথের অসংখ্য বন্ধু ও গুণমুগ্ধ ব্যক্তি তাঁর স্মৃতিচিহ্নস্থাপনার্থ একটি প্রকাশ্য সভারও আয়োজন করেন। ২২শে জুলাই (১৮৬৭) আপিল আদালত গৃহে একটি বিরাট শোকসভার অধিবেশন হয়। মাননীয় বিচারপতি লক এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় বক্তৃতায় অন্যান্য যোগ্যতর ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও তাঁকে ঐ পদে বৃত হবার কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন যে তিনি সদর কোর্টের (এক্ষণে হাইকোর্ট) প্রাচীনতম বিচারপতি এবং শম্ভুনাথকে উক্ত আদালতে উকিল অবস্থাতে দেখেছেন। তিনি আরও ব্যক্ত করেন যে ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে যখন হত্যাপরাধে অভিযুক্ত নবাব নাজিমের কতিপয় কর্মচারীর বিরুদ্ধে গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে উকিল নিযুক্ত হয়ে শম্ভুনাথ বহরমপুরে যান, তখন তিনি তাঁর সাথে পরিচিত হন এবং ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে যখন তিনি সদর কোর্টের বিচারপতি হয়ে আসেন, তখন শম্ভুনাথকে প্রত্যহ দেখেছেন এবং দিন দিন তাঁর শ্রদ্ধা বৃদ্ধিই পেয়েছে। তিনি উৎসাহশীল এবং পরিশ্রমী ছিলেন এবং সত্যনির্ণয়ের জন্য তিনি অক্লান্ত চেষ্টা করতেন এবং প্রকৃত তথ্য সযত্নে বিচারপতির গোচরে আনতেন। বিচারপতিরূপেও তিনি এরূপ অধ্যবসায়, সাধুতা ও স্বাধীনচেতনার পরিচয় দিয়ে গেছেন। অতঃপর

তিনি ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সম্পাদক (মহারাজ স্যর) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের ও বিখ্যাত ব্যারিস্টার ডব্লিউ এ-মন্ট্রিউ মহোদয়ের নিকট হতে প্রাপ্ত দুটি শোকসূচক ও সহানুভূতিপূর্ণ পত্র পাঠ করেন।

এর পর প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার মিষ্টার ডয়েন এক দীর্ঘ ওজস্বিনী বক্তৃতায় শম্ভুনাথের গুণকীর্তন করে প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে স্বর্গীয় শম্ভুনাথ পন্ডিত মহাশয়ের বিবিধ সদ্‌গুণাবলী স্মৃতিপটে চির দেদীপ্যমান রাখবার জন্য একটি সাধারণ স্মৃতিভান্ডার গঠিত হউক ও চাঁদা সংগৃহীত হউক। বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ এই প্রস্তাব সমর্থন করলে তা সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।

এই প্রস্তাব অনুযায়ী ২৫০ ০০ টাকারও বেশী অর্থ জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে দান করেন।

এই শোকসভায় নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণকে নিয়ে একটি স্মৃতিরক্ষণ সমিতি গঠিত হয়।

মাননীয় বিচারপতি এইচ-ভি-বেলি, মাননীয় বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, কুমার সত্যানন্দ ঘোষাল, মুন্সী আমীর আলি খাঁ বাহাদুর, বাবু দিগম্বর মিত্র, পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাবু প্যারীচরণ সরকার, বাবু শ্যামাচরণ মল্লিক, বাবু ভোলানাথ মল্লিক, বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাবু চন্দ্রমাধব ঘোষ, মিষ্টার মানকজী রুস্তমজী, মিষ্টার আর টি অ্যালান ও বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অবৈতনিক সম্পাদক।

এই শোকসভার একটি পূর্ণাঙ্গ কার্য বিবরণী হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল - পরে তা একটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়-তা এই বইয়ের পরিশিষ্ট অংশে সন্নিবেশিত হল।

এই স্মৃতিরক্ষণ সমিতির চেষ্টায় জনসাধারণের দেয় টাকা থেকে একজন জার্মান চিত্রকরকে দিয়ে শম্ভুনাথের একটি প্রতিকৃতি অঙ্কন করানো হয় যা কলকাতা হাইকোর্টের ৪ নম্বর এজলাসে আজও অবস্থিত। এর জন্য প্রায় ৪০০০ টাকা খরচ হয়। বাকি ২১৪৪৫ টাকা ভবানীপুর ডিসপেনসারি কমিটিকে দান করা হয় ডিসপেনসারির পরিধি বাড়িয়ে শম্ভুনাথের যথাযথ স্মৃতি রক্ষা করার জন্য। এই টাকা দিয়ে ১০৮ নং রসা রোডস্থ ৯ কাঠা জমি ৮৭৯২ টাকায় ক্রয় করা হয়। ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে ৬৮৫৩ টাকা খরচ করে ঐ জমিতে একটি বাড়ী তৈরী করা হয় এবং বাকী ৫৮০০ টাকায় সরকারি কাগজ ক্রয় করা হয়। ঐ বাড়ী কেবলমাত্র বর্হির্বিভাগের রোগীদের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হত। এই ডিস্‌পেনসারি ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে সুবার্বন কমিশনারের হাতে অর্পণ করা হয় যা বাৎসরিক ২০৬০ টাকা ব্যয়ে চালনা করা হত।

১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে এই ডিসপেনসারি কলকাতা কর্পোরেশনের আওতায় আসে।

১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে সরকার কলকাতার জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত তা পর্যালোচনা করে উপদেশ দেওয়ার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করেন। ঐ কমিটি সুবার্বন এলাকায় একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে। সরকার পুরাতন ডিসপেনসারিটিকে বন্ধ করে একটি নতুন হাসপাতাল এবং নতুন ডিসপেনসারি তৈরী করার প্রস্তাব গ্রহণ করে। ভবানীপুর পাম্পিং স্টেশনের জন্য নির্দিষ্ট ১২৯ কাঠা জমি ৬৪০০০ টাকায় অধিগৃহীত হয়। কলকাতা কর্পোরেশনকে পরিচালন সভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং বার্ষিক ৫০০০ টাকা অনুদান দিতে বলা হয়।

নতুন বাড়ীটির নির্মাণ ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে শেষ হয়। এবং ভবানীপুর হাসপাতাল নামাঙ্কিত হয়। ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে আরও কিছুটা জমি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত হয় এবং হাসপাতালের নাম পরিবর্তন করে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল রাখা হয়।

১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে আলিপুর জেলা আদালতে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ মামলা দায়ের হয়। আদালতের নির্দেশে ১০৮ রসা রোডস্থ বাড়ীটি নিলামে বিক্রয় করে অর্জিত টাকা এবং ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দের শম্ভুনাথ স্মৃতিরক্ষণ তহবিল থেকে কেনা কোম্পানির কাগজ সরকারকে হস্তান্তর করে সরকারের ট্রাষ্ট হিসাবে স্বত্বের বিলোপ ঘটানো হয়।

শম্ভুনাথের মৃত্যুর পর যাঁরা উনবিংশ-শতাব্দীতে কলকাতা হাইকোর্টে জজ হয়েছিলেন তাঁরা হলেন—

দ্বারকানাথ মিত্র	১৬-০৭-১৮৬৭ — ২৫-০২-১৮৭৪
অনুকুল চন্দ্র মুখার্জী	০৬-১২-১৮৭০ — ১৭-০৮-১৮৭১
রমেশ চন্দ্র মিত্র	৩০-০৭-১৮৭৪ — ০১-০১-১৮৯০
মহেন্দ্রনাথ ঘোষ	০১-০১-১৮৮২ — ০১-০৮-১৮৮২
চন্দ্র মাধব ঘোষ	১২-০১-১৮৮৫ — ০২-০১-১৯০৭
গুরুদাস ব্যানার্জী	১৯-১১-১৮৮৮ — ০১-০২-১৯০৪
আমীর আলী	০২-০১-১৮৯০ — ১৪-০৪-১৯০৪

উপরিউক্ত তালিকা থেকে স্পষ্ট যে ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে কলকাতা হাইকোর্টে দুজন করে ভারতীয় জজ নিয়োজিত হয়েছিলেন। এতে পরিস্কার হয় শম্ভুনাথকে দিয়ে যে ভারতীয়দের সর্বোচ্চ পদে নিয়োগের পরীক্ষামূলক প্রয়াস শুরু হয়েছিল তা শম্ভুনাথ যথাযথভাবে পালন করতে সফল হয়েছিলেন।

চারিত্রিক বিশিষ্টতা / চরিত্রায়ণ

শম্ভুনাথের সম্বন্ধে বিখ্যাত উকিল এবং পরে জজ (১২-১-১৮৮৫ থেকে ২-১-১৯০৭) জাষ্টিস চন্দ্র মাধব ঘোষ তাঁর Unpublished memoir তে মন্তব্য করেছেন Babu Sumboo Nath Pandit, a Cashmerian gentleman, who was born and bred up in the early life in Lucknow and who was formerly ministerial officer in the Sudder Court, was at the time of Babu Roma Prosad Roy's death junior Government Pleader, whose duty it was to conduct on behalf of Government all criminal appeals ; and he succeeded to the position of Baboo Roma Prosad Roy as Senior Government Pleader, Babu Jagadanand Mukherji taking his place as Junior Government Peader. Between the death of Babu Romaprosad Roy and his elevation to the Bench in 1863 he Sumboonath Pundit enjoyed the highest practice, his income being about Rs. 15,000/ a month and this was due to great extent the leading Vakils who could not address the Court in English, lost their practice as indicated above. He was very able and an assiduous person, full of qualities both of the head and the heart. He was noble minded, full of kindness and though he was not much of a lawyer in the proper sense of the word, his great rise in the profession of law, and his appoinment as the first Indian Judge of the High Court was but well deserved. His appointment was due to the recommendation of Sir Barnes Peacock who was much struck with the ability and fairness with which he always argued his cases and two appointment was very much appreciated as the best selection that could be made, I may here note that with all the large practice he enjoyed as a Pleader and the high position he held as a judge he never enjoyed the high influence which Romaprosad Roy did. This way due to his very retiring disposition, seldom visiting anybody, even any of the Judge's unless he was forced to do so.

উপরে উল্লেখিত শেষাংশটি যে কতটা সত্য তার প্রমাণ বহু জায়গাতেই পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে শম্ভুনাথের জীবনের একটি ঘটনা যা তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলেছিলেন এবং বিদ্যাসাগর তা সুযোগ পেলেই সর্বদা উল্লেখ করতেন,

খুবই প্রাসঙ্গিক, 'মান রাখতে না পারলে অপমানিত হতে হয়'। বিশেষ করে স্পর্শকাতর মন হলে তা সাংঘাতিক পীড়া দেয়। ঘটনাটি ছিল এরকম—

শম্ভুনাথবাবু একদিন হাইকোর্টের একজন জজ সাহেবের নিকট বসে আছেন। এমন সময় চাপরাশী সাহেবের হাতে একখানি কার্ড দিল। সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে অভদ্রোচিত গালিগালাজ করে চাপরাশীকে বললেন "বোলো সাবকো ফুরশুৎ নাহি হ্যায়"। চাপরাশী সাহেবের মেজাজ জানত, সেকথা আগন্তুককে না বলে সাহেবের পেছনে দাঁড়িয়ে রইলো। ক্ষণকাল পরে সাহেবের নজর পড়ল। সাহেব বিরক্তি সহকারে বললেন "আনে বোলো।" চাপরাশী দ্বারোদঘাটন করে আগন্তুককে ঘরে প্রবেশ করাতে না.করাতে সাহেব স্বয়ং দ্রুতপদে গিয়ে সাদর অভ্যর্থনা করলেন, দু হাতে তাঁর হস্ত ধারণ করে নিজাসনের একাংশে উপবেশন করালেন। তখন শম্ভুনাথবাবু দেখলেন আগন্তুক অপর কেহ নন, তারই বন্ধু সদর দেওয়ানি আদালতের প্রধান উকিল মুনসেফ আমির আলি সাহেব। শম্ভুনাথবাবু বিদায় হলেন। বিদায়কালে শুনতে লাগলেন জজ সাহেব মুনসেফ মহাশয়ের নিজের ও বাটীর পরিজন বর্গের কুশল বার্তা জিজ্ঞাসা করছেন। তিনি একমুহূর্ত পূর্বে যাঁর আগমন বার্তা শুনে ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হয়ে অসাক্ষাতে অভদ্রোচিত গালিগালাজ করছিলেন, তিনি সাক্ষাতে এত আপ্যায়িত করছেন। সেই অবধি শম্ভুনাথবাবু নাকি আর কখনও কোন সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতেন না।

হাইকোর্টের জজ মিঃ লক্ শম্ভুনাথের কথা বলতে গিয়ে বলছেন, উকিল হিসাবে তিনি ছিলেন উদাহরণ স্বরূপ এবং কোর্টের জুনিয়র দেশীয় উকিলগণ তাঁকে সর্বদা অনুসরণ করতেন।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সম্পাদক যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁর কথা বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন যে জজ হিসাবে তিনি তাঁর কর্মকুশলতা এমন একটা স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন যে সেখানে তিনি কেবল নিজেকে দেশবাসীর কাছে আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেননি, তিনি যেন জাতির মহৎ চরিত্রের প্রতিভূ হিসেবে নিজেকে স্থাপন করেছেন। শম্ভুনাথের মতো লোককে এই পদে নিয়োগকে তিনি বর্ণনা করেছেন শিক্ষা, যোগ্যতা, স্বাধীন চিন্তা এবং দৃঢ়চেতনা এগুলির সমন্বয়ে গঠিত একটি চরিত্রের নির্বাচন।

প্রখ্যাত ব্রিটিশ সমসাময়িক Mr. W. A. Montriou শম্ভুনাথ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মন্তব্য করে যে ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে যে

ইংল্যাণ্ড সবচেয়ে উপযুক্ত এবং শিক্ষিত ব্যক্তিকেই হাইকোর্টের জজ হিসেবে নিয়োগ করতে পারে।

বিখ্যাত সমসাময়িক আর একজন ব্রিটিশ আইনজীবী Mr. L. Doyne তাঁর বহুদিনের পরিচিত শম্ভুনাথ সম্বন্ধে বলেছেন এমন সত্যবাদী, নির্ভীক, সরল এবং নির্ভরশীল ব্যক্তিত্ব তাঁর গোচরে আর আসেনি। দেশীয় লোকেদের সর্বোচ্চ পদে নিয়োগ করার ব্রিটিশ রাজদরবারের এই প্রয়াসকে তিনি যেভাবে তাঁর কার্যকলাপ দ্বারা উপযুক্ত বলে প্রতিপন্ন করেছেন, তা শুধু প্রশংসনীয় নয়, অনুকরণের যোগ্য।

শম্ভুনাথের ব্যক্তিগত বিশেষ বন্ধু প্রখ্যাত আইনজীবী কৃষ্ণ কিশোর ঘোষ তাঁর বহুদিনের পরিচিত শম্ভুনাথ সম্বন্ধে বলেছেন তাঁর চরিত্র ছিল সম্মাননীয় ভদ্রলোকের মতো। তাঁর সামর্থ্য এবং কাজের প্রতি একাগ্রতা ছিল অপরিসীম। তাঁর এই গুণাবলীর জন্যই তিনি তাঁর সহকর্মী এবং আপামর জনসাধারণের প্রিয় পাত্র ছিলেন।

তৎকালীন প্রথিতযশা আইনজীবী বাবু অনুকূল চন্দ্র মুখার্জি যিনি পরে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হয়েছিলেন শম্ভুনাথ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে যখন থেকে তিনি কলকাতা Bar এ এসেছেন তখন থেকে তিনি তাঁকে অনেক ঘনিষ্ঠভাবে জানেন। যখনই কোন জুনিয়র উকিল Bar এ এসেছেন, দেখা গেছে অতি অল্পদিনের মধ্যেই শম্ভুনাথের ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন এবং তাঁরা শম্ভুনাথকে তাঁদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বন্ধু হিসেবে গণ্যও করছেন। এর কারণ বলতে গিয়ে তিনি জানাচ্ছেন তাঁর কাছে পাওয়া যেত প্রয়োজনীয় পরামর্শ/উপদেশ; বিপদে, ব্যক্তিগত অসুবিধায়, এমনকি "ব্রীফের" অভাবেও শম্ভুনাথ তাঁর আন্তরিক ব্যবহার এবং নিজের 'ব্রীফ' নিয়ে সাহায্যপ্রার্থী বন্ধুর পাশে হাজির। সরকারী উকিল হওয়া সত্ত্বেও তিনি অভিহিত হতেন "The advocate of the prisoners"। তিনি কখনও জ্ঞাতসারে কোর্টকে বা বিরুদ্ধপক্ষকে প্রতারিত করেননি। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলতে গিয়ে তাঁর দানশীলতার কথা বলেছেন। ভবানীপুরে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ক্ষতিগ্রস্তদের তিনি পরম মমতায় সেবা করেছেন - নিজের অর্থ, শ্রম, নিজের প্রতিষ্ঠার সুযোগ ব্যবহার করে প্রচুর লোককে কাছে টেনে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন উদ্ধার কার্যে। অনাথ, বিধবা বা যেকোন বিপদগ্রস্ত লোকের, শম্ভুনাথের কাছে হাজির হওয়াই ছিল যথেষ্ট - শম্ভুনাথ দানে মুক্তহস্ত। কত যে আত্মীয় স্বজন, বন্ধু, অপরিচিত ব্যক্তি, তাঁর নিয়মিত ভাতার ওপর নির্ভরশীল ছিল তা গুণে শেষ করা যায় না- দানগ্রহীতার জীবন যাপনও শম্ভুনাথের জীবন যাপনের

তুল্য ছিল। বহু ছেলের বিদ্যালয়ের বেতনও তিনি নিয়মিত বহন করতেন। এহেন দানশীল শম্ভুনাথ তাঁর নিজের ছেলেমেয়েদের জন্য বিশেষ কিছু রেখে যেতে পারেননি। অথচ জানা যায় ১৮৫০ থেকে ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শম্ভুনাথের গড় মাসিক আয় ছিল সুদীর্ঘ ১২/১৩ বছর সময় ধরে ১০,০০০ - ১৫,০০০ টাকা।

শম্ভুনাথের বহুদিনের ঘনিষ্ট বন্ধু বিশিষ্ট আইনজীবী মৌলভি আবদুল লতিফ খান বাহাদুর শম্ভুনাথ সম্বন্ধে বলছেন তিনি মুসলমান রীতিনীতি এবং তাদের জীবন প্রণালী সম্বন্ধে নিখুঁত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর অহেতুক হিন্দু ভালবাসা ছিল না, সব মানুষই তাঁর কাছে ছিল সমান।

বাবু দিগম্বর মিত্রও অনুকূল বাবুর মতো তাঁর দানশীলতার কথা বারবার উল্লেখ করেছেন, বিশেষ করে তিনি বলেছেন গরীব সাধারণ এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের কাশ্মীরিগণ তাঁর বাড়ীকে সর্বসময়ে আশ্রয়স্থল হিসেবেই গ্রহণ করেছে।

শম্ভুনাথের পরে যিনি হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং সুদীর্ঘ ২২ বছর ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন সেই চন্দ্রমাধব ঘোষের জীবনীতে শম্ভুনাথ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "একবার Review Case" এর একটা মোকদ্দমায় এক পক্ষে ছিলেন শম্ভুনাথ, বাবু কৃষ্ণ কিশোর এবং Allen সাহেব অপর পক্ষে শ্রীনাথ দাস এবং তাঁর ছাত্র চন্দ্রমাধব ঘোষ। তখন "Review Case" এ প্রথিতযশা ব্যারিস্টার বা বড় বড় উকিলরাই নিযুক্ত হতেন। উক্ত Case টি Justice Raikes এবং Justice Stear এর এজলাসে উত্থিত হয়েছিল। Justice Raikes নতুন উকিলদের প্রতি ভালরূপ ব্যবহার করতেন না। সেদিন কোন কারণ বশতঃ শ্রীনাথ বাবু এজলাসে উপস্থিত হতে পারেন নি এবং চন্দ্রমাধব বাবুকেই মোকদ্দমা চালাতে অনুমতি দেন। চন্দ্রমাধব বাবু খুব ভাল বক্তব্য রাখলেও Justice Raikes একে বালকোচিত সওয়াল জবাব বলে অভিহিত করেন। কিন্তু আদালতের বাইরে এসে আইনজ্ঞ বোদ্ধা উকিল শম্ভুনাথ চন্দ্রনাথবাবুকে বিশেষ প্রশংসা ও আদর করলেন। তিনি সকলের নিকট চন্দ্রমাধব বাবুর দক্ষতা বিষয়ে গল্প করতে লাগলেন। এতেই চন্দ্রমাধব বাবুর প্রসারের ও সৌভাগ্যের সূত্রপাত হয়।

শম্ভুনাথের প্রেসিডেন্সি কলেজের সুযোগ্য ছাত্র বাবু মহেন্দ্রলাল সোম তাঁর কথা বলতে গিয়ে বলেছেন তাঁরা (ছাত্ররা) ভেবে পেতেন না সদর আদালতের সবচেয়ে ব্যস্ত উকিল হওয়া সত্ত্বেও তিনি কিভাবে ছাত্রদের এত বিশদভাবে শিক্ষা দিতেন। বিষয় যোগাড় করতে তাঁর অনেক শ্রম এবং সময় দিতে হত। শুধু তাই নয়

তিনি ক্লাসে তাঁর দেওয়া সমস্ত বক্তৃতাই ছাত্রদের মধ্যে ছাপিয়ে বিলি করতেন। এতে সরকার থেকে তিনি আইন অধ্যাপক হিসেবে যে সাম্মানিক পেতেন তার থেকে তাঁর বেশিই খরচ হয়ে যেত। তিনি শ্রম বা অর্থ এ ব্যাপারে কোন চিন্তাই করতেন না।

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ছাত্র শম্ভুনাথ সম্বন্ধে বলেছেন, শম্ভুনাথের কর্মজীবন শুধুই উত্থানের সুসমঞ্জস এবং উঁচুতারে বাঁধা। তাঁর মন ছিল সত্যিকারের সংস্কারমুক্ত এবং সনাতন নীতিতে বিশ্বাসী। শম্ভুনাথ এমন একজন সহজাত সৃজনী ক্ষমতার অধিকারী বিরল ব্যক্তিত্ব, যে নিজেকে শিক্ষিত করেছে এবং কারও পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া নিজের শ্রম ও কর্মকুশলতা দ্বারা নিজেকে তৈরি করেছে এবং শ্রমসাধ্য ও সম্মানিত পেশায় নিজেকে নিযুক্ত করেছে। উকিল হিসেবে তিনি যেমন তাঁর মক্কেলদের কাছে ছিলেন বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা তেমনি জজদের কাছে ছিলেন পথপ্রদর্শক। মক্কেল, উকিল, জজ, সর্বোপরি নিজের প্রতি দায়বদ্ধতা এই সবকটি দিককে এক সূত্রে বেঁধে প্রত্যেককে সন্তুষ্ট করা এক দুরূহ কাজ — যা অতি সম্মানের সাথে শম্ভুনাথ করে দেখিয়েছেন - যা সত্যিই অবিশ্বাস্য।

অধীত বিদ্যা এং আচরণের মধ্যে যাঁর সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটে তিনিই সত্যিকারের শিক্ষিত ব্যক্তি-এই অর্থে শম্ভুনাথ ছিলেন শ্রেষ্ঠতমদের মধ্যে একজন। ১৮৬০ সালে বাৎসরিক অবকাশ ভ্রমণে মুঙ্গের ভ্রমণে সঙ্গী হয়েছিলেন তাঁর অধস্তন উকিল দীনবন্ধু সান্যাল মহাশয়। মুঙ্গোর থেকে জামালপুর যাত্রাপথে তিনি অতি কাছ থেকে দেখেছেন তাঁর পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা - তিনি প্রতিটি দৃশ্যই অতি নিপুণ প্রকাশ সৌষ্ঠবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। মাঝে মাঝে আলাপচারিতায়, তাঁর সহজাত বিশ্লেষণ ক্ষমতায় দৃশ্যের পশ্চাৎপট বর্ণনা করছেন বা আগের ভ্রমণের সময়ের সাথে তুলনা করছেন বা আগের সাথে বর্তমানের পার্থক্যের কারণ বিশ্লেষণ করছেন। এত কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি শম্ভুনাথ সম্বন্ধে অনুভব করেছেন তাঁর উচ্চমানের বাক্‌শক্তি ও কল্পনাশক্তির ঔজ্জ্বল্য। কোন আকর্ষণীয় কথোপকথনে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে— তাঁর অভিব্যক্তি হয়ে ওঠে খুবই মনোরম। শম্ভুনাথের চরিত্র চিত্রণ করতে গিয়ে তিনি আরও বলেছেন, তাঁর ঘরোয়া পরিবেশে সকলের সাথেই ছিলেন তিনি ভদ্র, নম্র অথচ বোদ্ধাভিমান থেকে সতত বিরত। তাঁর উচ্চতর অবস্থান কখনও কেউ অনুভব করত না। যাঁরা তাঁর কাছে সান্ত্বনা বা পরামর্শের জন্য আসতেন - কেউই বিফল হয়ে ফিরে যেতেন না - নম্র

ও অনাড়ম্বর প্রকাশ ভঙ্গির সঙ্গে সহৃদয়তা এবং আন্তরিকতা মিশ্রিত উপদেশ নবীন ও অনভিজ্ঞজনের হৃদয় স্পর্শ করতে কখনও ব্যর্থ হয়নি। তাঁর কথোপকথন ছিল পরম আনন্দদায়ক। তিনি ছিলেন নিরপেক্ষ দর্শকদের এক পরিপূর্ণ নিদর্শন, সহৃদয় সমালোচক, সকলের প্রতি দয়ালু, খুবই পরিচ্ছন্ন, ধীর এবং সতত ন্যায়পরায়ণ। বিদ্বেষ প্রসূত কিন্তু কৌতূলোদ্দীপক যে সব গুজব শুনতেন সেগুলি বিশদভাবে তিনি পরিবেশন করতে পারতেন। তাঁর রসিকতাগুলো ছিল নির্দোষ এবং কাউকেই আঘাত করত না, পোষ্যদের কখনও কোন রূঢ় কথা বা ভৃত্যদের আত্মমর্যাদাহানিকর কথা বলতেন না। যে সমস্ত অনুভূতি মানুষের জীবনকে মধুময় করে তোলে, শম্ভুনাথের অন্তঃকরণকে তার পীঠস্থান বলা যায়। শম্ভুনাথ উপলব্ধি করতেন তাঁর চরিত্রের চরম সংবেদনশীলতাই তাঁকে সাধারণের থেকে ব্যতিক্রমী করেছে। সেজন্য তিনি তথাকথিত আনন্দোৎসবে গা ভাসিয়ে দিতে পারতেন না। তখনকার দিনেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন কলকাতার সমাজের বৈশিষ্ট — সামাজিক একাকিত্ব। তিনি বলতেন এই নিঃসঙ্গতা সঙ্গীহীন অবস্থা নয়। নিঃসঙ্গদের ভিড়। তাঁর বহুদিন পূর্বের অনুভূতি আজকাল যেকোন চিন্তাবিদেরই অনুভূতি।

শম্ভুনাথের আতিথেয়তা ছিল অপরিসীম। যে কেউই তাঁর কাছে যেতেন কিছু না কিছু জলযোগ না করে ছাড়া পেতেন না। বন্ধু-বান্ধবসহ সাধারণ ভোজনোৎসবের সামাজিক সমাবেশ প্রায়শঃ হত। বৎসরে একবার তাঁর গৃহে নাচগান সহ সামাজিক সান্ধ্যভোজনোৎসব হত যেখানে তাঁর বন্ধু বান্ধব, সামরিক ও সরকারি পদস্থ ব্যক্তিরা নিমন্ত্রিত হতেন। এই সান্ধ্য জমায়েতগুলি খুবই জনপ্রিয় ছিল এবং যাঁরাই তাঁর অতিথি হয়েছিলেন সস্নেহে তাঁরা তা পরবর্তীকালে স্মরণ করতেন।

তখনকার দিনে পরস্পর অনেকেই অকপট বন্ধু ছিলেন। সকলেই সকলকে ভালবাসতেন। কিন্তু প্রতিদিন একত্র সম্মিলন হওয়া সম্ভবপর নয় অথচ সকলেই সকলের সান্নিধ্য চায়, এক্ষেত্রে জজ শম্ভুনাথ, দ্বারকানাথ বাবু, চন্দ্রমাধব বাবু, হেমবাবু, রমেশ বাবু, অনুকূলবাবু, অন্নদাবাবু প্রমুখ বন্ধুগণ শম্ভুনাথবাবুর প্রতিষ্ঠিত বান্ধব মিলন মন্দিরে সন্ধ্যার পর মিলিত হয়ে আনন্দ উপভোগ করতেন। নানা বিষয়ে আলোচনা হত।

দীনবন্ধু সান্যাল মহাশয় তাঁর দান ধ্যানের কথা বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, যদি তাঁর জমা খরচের খাতা থেকে কিছু উল্লেখ করা যায় তবে তাঁর গৃহ পরিচালনা সম্বন্ধে কিছু আভাস পাওয়া যেতে পারে। তিনি ভবানীপুরে তাঁর স্বগৃহে বাস করতেন

এবং জজ হিসাবে তাঁর আয় ছিল বাৎসরিক ৫০,০০০ টাকা, আইনজীবী থাকাকালীন, তাঁর আয় ছিল অনেক বেশি। তাঁর আতিথেয়তা ও দয়া দাক্ষিণ্য তাঁর আয়ের থেকে বেশি ব্যয় করতে বাধ্য করত এবং তার জন্য পুরোনো জমা টাকায় হাত পড়ত। তাঁর অ্যাকাউন্ট বই এর তিন চতুর্থাংশ ভর্তি হত দান ধ্যান, আতিথেয়তা ও উপহারাদির খরচের জন্য। দূর থেকে তাঁর কাছে এলে বা কেউ সাহায্য চাইলে তিনি উন্মুক্ততার সীমা রাখতেন না। তাঁর দয়া দাক্ষিণ্যের কোন সীমা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তিনি অপরের জন্যই জীবন ধারণ করতেন। যখন তিনি জজ হলেন তখনও তিনি তাঁর সীমাবদ্ধ আয়ের কথা মনে রাখতেন না। বন্ধু-বান্ধব ও মেধাবীজনের জন্য তাঁর মতো এত উৎসাহ কারও ছিল না, তা তিনি অখ্যাত স্থানেই থাকুন বা খারাপ অবস্থাতেই পড়ুন। বদান্যতার এই উদাহরণ লিপিবদ্ধ করতে সত্যই আনন্দ হয়।

প্যাট্রিয়ট পত্রিকা বলেছে, "দরিদ্র আত্মীয় ও অন্যান্য জনের বিশেষ করে ভবানীপুরের জন্য শম্ভুনাথের ব্যক্তিগত দান ছিল মাসিক দুই হাজার টাকা। তাঁর দান ধ্যানের সীমার এই অনুদান মোটেই অতিকথন নয়। সেই সময় কয়জনই বা কিঞ্চিতাধিক মাসিক ৪,০০০ টাকা আয় থেকে মুক্ত হস্তে এবং সানন্দে এতটা পরিমান দয়া দাক্ষিণ্যের জন্য ব্যয় করত, তাও আবার জনসাধারণের ও সংবাদ মাধ্যমের অগোচরে। অসুস্থ জনেদের জন্য যাঁরা চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করতে পারতেন না তাঁদের তিনি ঔষধ ও পরামর্শ দিতেন। শিক্ষার ব্যাপারে তিনি ছিলেন এক উৎসাহী বন্ধু। প্রচুর সংখ্যক অনাথ ও দরিদ্র ছেলেরা তাঁর খরচে লেখাপড়া করত। এমনকি প্রয়োজন বোধে তাঁর কাছে রেখেও বহু ছাত্রকে পড়াশুনা করতে তিনি সাহায্য করেছেন। কি অফুরন্ত সদাশয়তার ক্ষীরধারা এই মানুষের থেকেই না বয়ে যেত। যখন চোখেব সামনে কঠিন অন্তঃকরণের ব্যক্তিদের সমারোহ বেশি তখন যেন পরম আশ্বস্থ হওয়া যায় এই মানুষের দিকে ফিরে, যাঁর হৃদয় দিনের মত উন্মুক্ত হয় ললিত দাক্ষিণ্যে। এমনই ওর কোমল হৃদয় যে, বিস্ময় হয় না যখন দেখা যায়, জেনে বুঝেও সন্দেহভাজন আবেদকদের নাছোড়বান্দা কাকুতি-মিনতিকে জয় করতে পারেন না। এখনকার দিনে তাঁর খরচার কথা ভাবলে তাঁকে হঠকারী বলা যায়। এই বিষয়ে তাঁর চরিত্রে তাঁর পিতার চরিত্র লক্ষণীয় ভাবে প্রভাব ফেলেছিল।

তিনি বিশ্বাস করতেন তাঁর পূর্বপুরুষদের ধর্ম কুসংস্কারে ভরা তবু এই ধর্মের মধ্যে অনেক কিছু মহত্ত্ব ও সত্য নিহিত ছিল এটা স্বীকার করতেন। এইজন্যই তিনি পূর্বপুরুষদের অনেক আচার মেনে চলতেন। সব যুগের অভিজ্ঞতা এটা দেখিয়েছে

তাঁর মতে ব্যাপক এবং অতীব কার্যকর কল্পনাশক্তি যা বংশ পরম্পরায় অব্যাহত থেকে সঞ্চারিত হয়, তাই একটা দেশের সরকারের মূল চালিকাশক্তি। সরকার গঠিত হয় জনমতে। জনমত যদি সঠিক কল্পনাশক্তির দ্বারা চালিত হয়-তবেই তাঁদের মতে গঠিত সরকার কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে। শম্ভুনাথের জীবনের কর্মধারা বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয়যে উপরি উক্ত মতবাদকে তিনি মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন এবং বাস্তবায়িত করতে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন।

শিক্ষা সম্বন্ধে শম্ভুনাথেব ধারণা ছিল খুবই স্পষ্ট। তাঁর মতে শিক্ষা হল সত্যিকারের জ্ঞান যা মানুষের চরিত্র গঠনে সাহায্য করে এবং তাদের কার্যকলাপে তা প্রতিফলিত হয়। জাগতিক সম্পদ বৃদ্ধি বা শেক্সপীয়র, মিলটন বা বেকনের কিছু রচনা মুখস্থ বলতে পারার মধ্যে নয়, পূর্বপুরুষদের চেয়ে উন্নতমানের ন্যায় বিচারের ক্ষমতাপ্রাপ্তিই সত্যিকারের শিক্ষা, কিছু কিছু পুরানো অনৈতিকতা দূর হচ্ছে, কিছু উন্নত রুচির কাজ বর্তমানে দৃষ্ট হচ্ছে - যা সত্যিকারের শিক্ষার ফলেই সম্ভব হয়েছে। বর্তমান ইংরাজি প্রতিষ্ঠানগুলির ভাল দিকগুলি, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতির চর্চার অভ্যাস আমাদের যুবকদের গ্রহণ করতে হবে, অন্যদিকে অতন্দ্র প্রহরীর মতো ভারতীয় সভ্যতার ভাল দিকগুলি তাদেরই রক্ষা করতে হবে - যা কোন সত্যিকারের শিক্ষা দ্বারাই আয়ত্ত করা সম্ভব।

শম্ভুনাথ মাছ ধরতে খুব ভালবাসতেন। তাঁর এই শখ পূরণের জন্য তিনি যে কয়েকটি বাগানবাড়ী ক্রয় করেছিলেন সেগুলি সাধারণতঃ নির্জন স্থানে এবং পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল। সেগুলি ছিল পুকুর বা ডোবা বা বদ্ধ জলাশয় যা পোকামাকড় ভর্ত্তি বা জঞ্জালপূর্ণ বা আধা ডোবা অবস্থায়। তিনি বহু অর্থব্যয় করে প্রতিটি বাগানবাড়ীই সংস্কার করে এবং জলাশয়গুলি ঠিকমতো কাটিয়ে পরিষ্কার করে মাছ ছেড়েছিলেন। এবং সমস্ত পরিবেশটাই বসবাস উপযোগী করে তুলেছিলেন। তিনি তাঁর উৎসাহী বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে একটা মাছ শিকারি ক্লাব গড়ে তুলেছিলেন এবং ছুটির দিনে প্রায়শই ঐ সমস্ত শৌখিন মাছ শিকারিদের নিয়ে ক্রীত বাগানগুলির যে কোন একটিতে মাছ শিকার করার জন্য চলে যেতেন এবং দেখা যেত ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছিপ হাতে চিরাচরিত মৃদু হাস্যমুখে জলাশয়ের ধারে বসে আছেন। শোনা যায় মাছ ধরাতে অকৃতকার্য হলে স্ত্রীর কাছে উপহাসাস্পদ হওয়ার ভয়ে ফেরার পথে বাজার থেকে মাছ কিনে নিয়ে ফিরতেন।

তাঁর পারিবারিক বন্ধু গোবিন্দপ্রসাদ পণ্ডিত বর্ধমান জেলার রানীগঞ্জের সিয়ারসোলের জমিদার ছিলেন। তিনি কখনও কখনও সেখানেও যেতেন। তাঁর বাগানবাড়ীর (জলাশয় সহ) এমন শখ ছিল যে তিনি ওখানেও পুষ্করিণীসহ একটা বাগানবাড়ী কিনেছিলেন। আজও ওখানে একটা বড় আকারের জলাশয় আছে যা শম্ভুনাথ পুকুর নামেই মুখে মুখে প্রচলিত।

শিশু বয়সে শম্ভুনাথ বেশ কয়েক বছর লক্ষ্ণৌতে মামার বাড়ীতে বাস করেছিলেন। চোদ্দ বছর বয়সে কলকাতায় ফিরে আসার কয়েক বছর বাদে যখন পুনরায় লক্ষ্ণৌতে যান তখন তাঁর উর্দু ভাষায় ব্যুৎপত্তি অনভ্যাসের দরুন এত নিম্নমানের হয়ে গিয়েছিল যে তাঁর মামা মন্তব্যই করে ফেলেছিলেন "এই ছেলে বাঙ্গালী" কারণ ছোট বয়সে তিনি লক্ষ্ণৌতে যখন ছিলেন তখন তিনি প্রধানত উর্দু এবং ফারসী ভাষাই শিক্ষা করেছিলেন। ফল স্বরূপ পরের কিছুদিন মামার বাড়ী থেকে বেরোনো পুরো বন্ধ ছিল।

তিনি প্রায় প্রত্যেক বছরেই দশেরা উৎসবের ছুটিতে লক্ষ্ণৌতে আত্মীয়দের কাছে যেতেন।

হাইকোর্টের জজ হবার পর লক্ষ্ণৌতে তাঁর ছেলের বিয়ে উপলক্ষে খরচের তোয়াক্কা না করে মোটামুটি ৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উৎসব পালন করেছিলেন। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, অঢেল সুস্বাদু খাদ্য এবং যথেচ্ছ দানে এই মহোৎসব পালিত হয়েছিল যা বহু জনের বহু দিনের আলোচনার বস্তু ছিল।

শম্ভুনাথের চরিত্রে তাঁর মামার প্রভাব ছিল অপরিসীম। শম্ভুনাথ তাঁর মামার সম্বন্ধে বহু কথা বা ঘটনা তাঁর বন্ধুদের কাছে গল্প করতেন । তিনি ছিলেন আপদে বিপদে অকুতোভয়। যখন লক্ষ্ণৌ অহোরাত্র আগুন আর তরবারিতে আক্রান্ত, লুঠেরাদের দৌরাত্ম্যে অস্থির, ভাঙচুরের খেলায় মত্ত, একের পর এক সুউচ্চ মিনার, গম্বুজ, সুদৃশ্য অট্টালিকা ধূলায় লুণ্ঠিত হচ্ছে, সমস্ত সুন্দরই ধ্বংসের তালিকায়, যখন বেশির ভাগ লোকই ঘরবাড়ি ছেড়ে নিজের পরিবারের লোকজন নিয়ে পলায়নপর, তখন এই বৃদ্ধ মানুষটি তাঁর পরিবার নিয়ে বাড়ীতেই ছিলেন। সেই সময়ের আরও দু একটা ঘটনা তাঁর সম্বন্ধে বলা যায়, যা শম্ভুনাথে ওপর প্রভাব ফেলেছিল।

একদিন বাড়ীর দরজার সামনে তাঁর মামা একটা টুলের উপরে বসেছিলেন। কয়েকজন সশস্ত্র বিদ্রোহী সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তাদের মধ্যে একজন মুহূর্তের

অসাবধানতা বশতঃ মাত্র কয়েকগজ দূর থেকে তাঁর দিকে বন্দুক ছুঁড়ে মারল - তাঁর কান ঘেঁষে গুলিটি বেরিয়ে গিয়ে তাঁর দরজার পাল্লায় ঢুকে যায়। দুর্বৃত্তটি দ্বিতীয়বার মারার চেষ্টা না করে তার দলবলের সাথে মিশে চলে যায়। বৃদ্ধের মুখে সারাক্ষণ মৃদু হাসি লেগেই ছিল।

আর একদিন তিনি দোতলায় তাঁর বৈঠকখানায় বসেছিলেন। এমন সময় বেশ কয়েকজন সৈনিক তাঁর সামনে এসে হাজির এবং তাদের হাবভাব এমন যেন তারা খুব সঠিক কাজই করছে। বৃদ্ধ অকুতোভয়ে মুখের স্নিগ্ধ হাসিটি বজায় রেখে তাদের বসতে বলে, সরবত, বাদাম এবং কয়েক ছিলিম তামাক পরিবেশন করলেন - এরকম ব্যবহারে একজন ভদ্র নাগরিকের প্রতি তাদের বক্তব্য কি রকম হওয়া উচিত - এই বোধোদয় হওয়াতে তারা লজ্জিত হল এবং বন্ধুভাব নিয়ে বিদায় নিল।

এই অমায়িক ভদ্র ব্যবহার, বিপদে নির্ভীক এবং সর্বোপরি মুখের সুন্দর স্মিত হাসি-একমাত্র তিনিই বজায় রাখতে পারেন যিনি সর্বাবস্থায় সমজ্ঞান - যা শম্ভুনাথের চরিত্রে ছিল চিরস্থায়ী - যা তিনি আয়ত্ত করেছিলেন তাঁর মামার কাছ থেকেই।

দীনবন্ধু মিত্র তাঁর সুরধুনী কাব্যে শম্ভুনাথকে চিত্রিত করেছেন এইভাবে—

'হাইকোর্ট বিচারের আসন নীরজ,
এ দেশের শম্ভুনাথ বসিয়াছে জজ,
সুদক্ষ বিচারে অতি, নিরীহ নিতান্ত,
গুণে যুধিষ্ঠির ধীর, রূপে রতিকান্ত।